# স্বামী বিবেকানন্দ

যখন নতুন চিন্তানায়কের চিন্তা কর্ম আদর্শ একটি সময়কে বিধৃত করে তখন নিশ্চিতে তাকে যুগ-সন্ধিক্ষণ বলা যায়। উনবিংশ শতাব্দী তেমনি এক কাল যা বহু মনীষীর জ্যোতিপ্রভায় উজ্জ্বল; বিবেকানন্দ এই মনীষীকুলের অন্যতম। তিনি শুধু তেজোদীপ্ত সন্ন্যাসী নন—একটি পূর্ণ পুরুষ। অসাধারণ প্রজ্ঞায় কি দর্শন কি সাহিত্য কি ত্যাগ কি স্বাজত্য-স্বাধীনতাবোধ প্রতি ক্ষেত্রে এক বিপ্লবকে জোয়ারের মতো প্লাবিত করেছেন।

অতি প্রাকৃত প্রতিভার পরিপুষ্টিতে জগতে বেদান্ত ধর্মকে এক গৌরবের আসন দিয়েছেন—যার ফলে আজও সুদূর আমেরিকা, পাশ্চাত্য দেশ তাঁকে স্মরণ করে শ্রদ্ধায় অবনত; এবং ভারতভূমি পবিত্র বেদ ও উপনিষদের উৎসরূপে মহিমান্বিত।

বিবেকানন্দর সেই সমগ্র জীবনের আলোচনা করা অসাধ্য। এ গ্রন্থ শুধু তাঁর জীবনের মোটামুটি ঘটনা নিয়ে রচিত।

প লা শী প্র কা শি ত
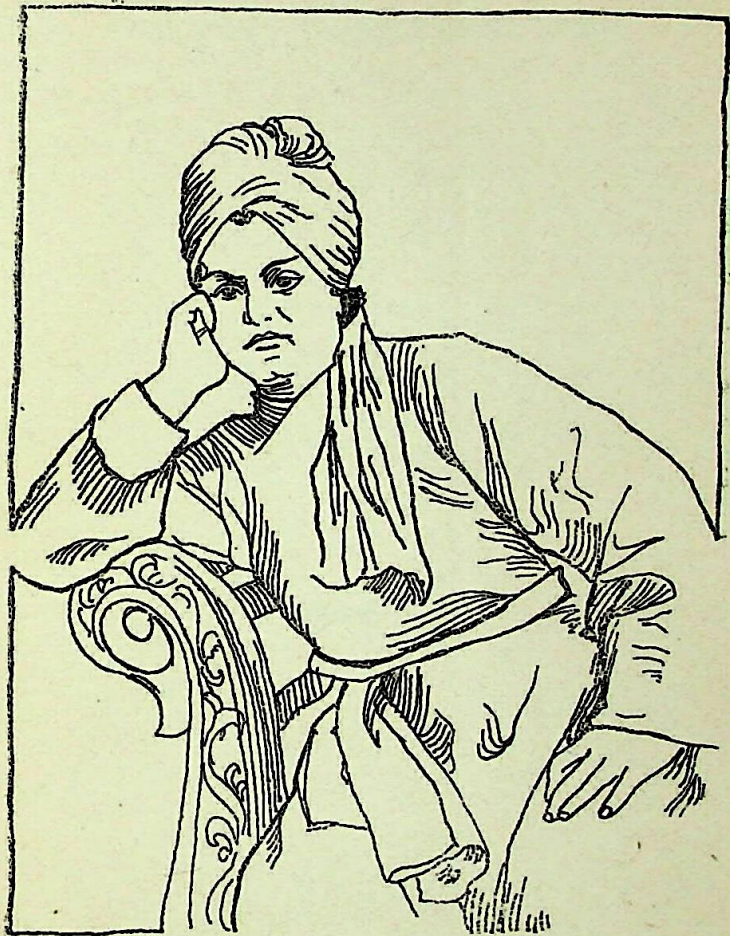
স্বামী বিবেকানন্দ

# স্বামী বিবেকানন্দ
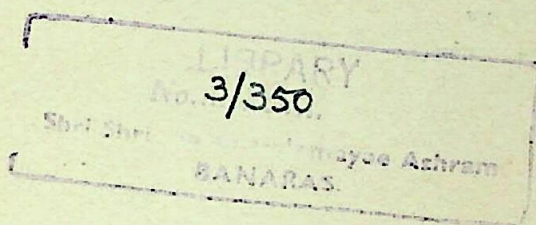
অন্নপূর্ণা দেবী

পরিবেশক : নব গ্রন্থ কুটির, ৫৪ ৫এ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ১২

প্রকাশক : সজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
৭এ রাজা লেন, কলকাতা ৯

মুদ্রক : বনগ্রাম সামন্ত
মহেন্দ্র প্রেস, ৫৮ কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলকাতা ৬

প্রচ্ছদ : চারু খান
প্রচ্ছদ মুদ্রক : মোহন প্রেস

মূল্য : ২·০০

স্বামী বিবেকানন্দ

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে সিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউট ভবনে বিরাট কলম্বাস হলে ত্রিশ বছরের একটি যুবক সনাতন হিন্দুধর্মের পক্ষে বক্তৃতা দিতে উঠলেন। একটি গম্ভীর নির্ঘোষ অকস্মাৎ সমস্ত শ্রোতার কণ্ঠকে বিমুগ্ধ করে বেজে উঠল ; 'আমেরিকা-বাসী ভাই ও বোনেরা' এতক্ষণের বিরাজিত নিস্তব্ধতা সহসা করতালি-ধ্বনীতে মুখর হয়ে উঠল। প্রতিটি উপস্থিত ব্যক্তির দৃষ্টি স্থাপিত তখন মঞ্চের পর গেরুয়া বসন পরিহিত তেজোদীপ্ত যুবকের পর ; যেন ঈশ্বর স্বয়ং আপন মহিমা কীর্তনের জন্য এই অপরাহ্ণে দণ্ডায়মান—সেই যুবকই বাংলার অমিত তেজস্বী নবযুগের সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন লীলাক্ষেত্রে অবতীর্ণ—তাঁর প্রসন্ন সেই লীলায় রৌদ্রতেজ কখনো বিচ্ছুরিত হয় নি এ-কথা স্বয়ং তিনি নিশ্চিত জানতেন। আর জানতেন বলেই আপন আধারের সঞ্চিত সকল তেজ মানসপুত্র নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে সঞ্চারিত করেন। বিবেকানন্দ সেই তেজ গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হলেন না। সূর্যের মতো প্রদীপ্ত হয়ে জ্বলে উঠলেন ; ব্যাপ্ত হয়ে রামকৃষ্ণ মন্ত্রকৈ জগতে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

প্রত্যেক দেশের এক একটা এমন সময় আসে যখন সেই দেশ মহাত্মাদের আগমনে পুণ্যভূমিতে পরিগণিত হয়। বাংলা দেশে ঊনবিংশ শতাব্দী তেমনি একটি সন্ধিক্ষণ।

এর পূর্বে বিদেশী শাসনে নির্যাতিত বাংলার ধর্ম তমসায় পর্যবসিত হতে চলেছে ; সনাতন হিন্দুধর্মের অন্তরে আত্মকলহ স্বৈরাচার সামাজিক শুচিবায়ুর হাওয়ার হাত থেকে বাঁচবার জন্য বিদেশী ধর্মে মানুষ আশ্রয় নিচ্ছে। অসহায় যারা, হিন্দুধর্মর শরণ নিয়ে মার খাচ্ছে ; তাদের মানসিক অবস্থাও দ্বিধায় টলমল।

এমন সময় তিমির অন্ধকার ভেদ করেই যেন শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। তিনি একটি শতদল হয়ে ফুটে উঠলেন। তাঁর চতুর্দিকে ধর্মপিপাসু আশ্রয় অভিলাষী পীড়িত মানুষ জড় হল।

অবিশ্বাসের আশঙ্কা কেটে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রসন্ন হয়ে দু'হাতে কৃপা ছড়ালেন চরাচরে। সেই কৃপাধন্য আশীর্বাদ নিয়ে দ্বিধাজড়িত ভস্ম ত্যাগ করে বিবেকানন্দ বেরিয়ে এলেন সূর্য হয়ে। নির্ভয় তাঁর চিত্ত সুদূর সাগর পারেও হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারে মুখর হয়ে উঠল। আপন মহিমা প্রকাশের জন্য পরমপুরুষ শ্রীঠাকুরই মানসপুত্রর হৃদয়ের ভিতর থেকে দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়লেন।

বিবেকানন্দ শুধু ধর্মপ্রচার বা তাঁর গুরুর কীর্তিগান করবার জন্যই এসেছিলেন তা নয়। একদা প্রপীড়িত জনসাধারণের মধ্যে যে ক্লীবত্ব ভীরুতা আত্মমর্যাদা বোধ বিদেশীর কৃপালাভে ব্যাকুল বাঙালীর তথা ভারতবাসীর মনে কালী লেপন করছিল তার উচ্ছেদ করেছেন অমিত শক্তিতে, দেশবাসীর মনে নব জাগরণের সুষ্ঠু চিন্তার সঙ্গে ধর্মবোধের ও সেবার সমন্বয়ে স্বাধীনতা বোধকেও জাগ্রত করে তুললেন। ভারতীয় নারীত্বকে স্বস্থানে পুনরুজ্জীবিত করলেন।

বাঙালীর স্বাধীনতার চেতনা বোধ, নারীদের শিক্ষা বিকাশ হিন্দুধর্মের অপার গৌরব, মানসিক বল প্রভৃতি সকল কিছুর মূলেই এই দৃপ্ত-পুরুষ সন্ন্যাসীর সাধনা রয়ে গেছে। যিনি সমস্ত জীবন দিয়ে আদর্শ আর ত্যাগের ধ্বজা উড়িয়ে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে পরিণত হলেন। তিনি যেমন একাধারে রামকৃষ্ণের মতো গুরু পেয়েছেন—তেমনি তার মতো শিষ্য প্রত্যেক গুরুরই কাম্য এ-কথা তাঁর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের অকৃপণ স্নেহ আশীর্বাদ প্রভৃতিতে সুস্পষ্ট হয়ে আছে।

একাধারে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত জ্ঞানী তিনি, তিনি দার্শনিক, যেন সকল যুক্তির সার, সর্বোপরি কঠোর তপস্বী—এই সকল সাবলীল

গুণের আধার বলে বাংলা দেশ তাঁকে আপন বুকে পেয়ে ধন্য। এবং এই বাংলার নবজাগরণের কাল তাঁর কর্মে আদর্শে ত্যাগের মহিমায় ইতিহাসে স্বর্ণরেখায় ভাস্বর।

অবিশ্বাসী সন্দেহর দোলা বুকে করে ঈশ্বর খুঁজেছেন তিনি। পথে পথে মন্দিরে দেবালয়ে পণ্ডিতদের কাছে সন্ধান না পেয়ে সংশয়ী হয়েছেন। এমন সময় ঈশ্বর তাকে নিজে তুলে নিলেন আপন ক্রোড়ে। তিনি আছেন শুধু এই বিশ্বাস নয়—তাঁর সস্নেহ হাতের স্পর্শে অগ্নি জ্বলে উঠল। নরেন্দ্রনাথরূপী খোলস ছেড়ে প্রকাশ হল বিবেকানন্দর। একটি যুগের পরিবর্তন সাধন করলেন তিনি।

বিদেশীদের চোখ পড়ল ভারতের দিকে। সনাতন হিন্দুধর্মের কস্তুরী গন্ধ বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। আমেরিকার ধর্মসভায় অন্যান্য ধর্মের পাশে সগৌরবে হিন্দুধর্মের ধ্বজা অম্লান হয়ে তার উদারতা বিশালতা প্রকাশ করল। ইংরেজ শাসিত অন্ধকারময় দেশের মহিমা ফুটে উঠল নব চেতনায়। একটি পুরুষের প্রমত্ত তেজের জোয়ার একটি দেশের ভুলুণ্ঠিত ধর্মকে সরবে ঘোষণা করল। ইংলণ্ড আমেরিকার মানুষ পাগল হয়ে ছুটে এল এই সন্ন্যাসীর পায়ে। তাঁকে বরণ করল গুরুর পদে। সহাস্যে তাদের স্থান দিলেন বিবেকানন্দ। মঠ স্থাপিত হল বহির্ভারতে। হিন্দুধর্ম প্রচারের প্রতিষ্ঠান। যা সর্বদা কল্যাণের পথ, আলোকের পথ, সত্যের পথ নির্দেশ করে।

ভারতবর্ষ নিবেদিতাকে পেল। সিস্টার নিবেদিতা। যিনি গুরুর অভয় পদ পেয়ে একটি সেবার শিখার মতো জ্বলে উঠলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা সংবরণের পর তার অগণিত ভক্ত যখন দিশেহারা বিবেকানন্দ তখন তাঁদের এক করলেন। একত্র করলেন সংহত ক্ষমতায়। শ্রীমার চার পাশে ভক্তরা নব ভ্রাতৃত্বের অপূর্ব বন্ধন রচনা করে দুঃখ-পীড়িত কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশে জেগে উঠল। 'তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ'

মন্ত্র সার করে একদল সন্ন্যাসীকে নিয়ে সেবার ব্রতে ধর্ম প্রতিষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা কীর্তনে বিবেকানন্দ অপার তেজে অবতীর্ণ হলেন।

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হল সর্বত্র। দলে দলে শরণার্থীরা আশ্রয় পেল। শ্রীরামকৃষ্ণের আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করলেন বিবেকানন্দ। বস্তুত বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণেরই আরেক দিক। নয়তো এই অমানুষিক বিস্তার সম্ভব ছিল না। বিবেকানন্দ একটি শক্তির খনি। তেজের আকর। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে স্পর্শ মাত্র তাঁর জ্ঞানচক্ষু জ্বলে উঠল। হৃদয়ে সুপ্ত অগ্নিতেজ আবরণ ভেদ করে সমস্ত আলোকিত করল। শেষ হল সন্দিগ্ধ মনের সন্ধান। দ্বিধা বস্ত্রের মতো খসে পড়ল। তন্ময় চিত্ত গুরুকে গ্রহণ করে প্রকাশিত হল আপন সিদ্ধিতে।

শুধু ধর্মে মুক্তি নেই, শুদ্ধি কর্মে। কর্মের বাণী শোনালেন সন্ন্যাসী। নিজে কাজ করে অন্যকে কর্মে ব্রতী করলেন। পাশাপাশি ধর্ম আর কর্ম একত্র বেজে উঠল। তাঁর কাছে যেমন দেবিকার আসনে শ্রীমা—তেমনি দেশমাতৃকা। দেশের অপমান লাঞ্ছনা শিক্ষার অভাব প্রভৃতি তাঁর বুকে শেলের মতো বিঁধেছিল। গুরু ভাইদের বললেন, নিজের মুক্তির জন্যই সব নয়—দেশকে উদ্ধার করো, সকলকে মুক্ত করো অন্ধকার থেকে—শিক্ষার আলোয় ভরে উঠুক দেশ ; নারীদের কুসংস্কার দূর করে সীতা সাবিত্রী হবার আহ্বান জানালেন।

একটি প্রদীপ্ত অকম্পিত অম্লান তেজের শিখা সমস্ত তেজ ছড়িয়ে নিঃশেষ হল। সামান্য সময়ে ব্যাপক উদ্দীপনার সঞ্চার করে তাঁর মহাপ্রয়াণ। যখন বুঝলেন অন্যে তাঁকে বুঝেছে তাঁর কর্মকাণ্ডকে আয়ত্ব করেছে—তখুনি আর প্রয়োজন নেই জেনে নিজেকে সমাপ্ত করলেন। তাঁর লীলার শেষ হল।

স্বল্পকালের লীলাবিধৃত সেই বিশাল জীবনের কথা নিয়ে এই গ্রন্থ।
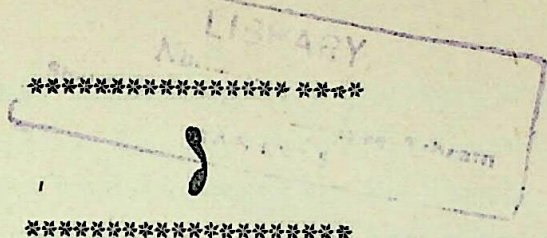
স্বামী বিবেকানন্দর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব নাম নরেন্দ্রনাথ। কলকাতার সিমলা অঞ্চলে বিখ্যাত দত্ত বংশে ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী বিবেকানন্দর আবির্ভাব হয়। পিতার নাম ৺বিশ্বনাথ দত্ত, মাতার নাম ভুবনেশ্বরী। ভুবনেশ্বরী রূপে গুণে ছিলেন অতুলনীয়া। বুদ্ধিমতী ও দেবভক্তি পরায়ণা। যাঁর গর্ভে শিবের অংশ বিশেষ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের মানস পুত্র বিবেকানন্দ জন্মালেন এ তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

সন্ন্যাস জীবনের প্রতি নরেন্দ্রনাথের অনুরাগ বংশগত।

তাঁর পিতামহ ৺দুর্গাচরণ দত্ত সর্বদা সাধু সঙ্গে দিন কাটাতেন তাঁদের সেবা করতেন। তাঁর পিতার ন্যায় তিনিও আইন ব্যবসায়ে প্রচুর নাম করেন কিন্তু যশের প্রতি তাঁর লোভ ছিল না। পঁচিশ বৎসর বয়সে সংসার পেছনে ফেলে দুর্গাচরণ একদিন গৃহত্যাগ করলেন।

সিমলার দত্তবাড়ি এখনো বর্তমান। যদিও আগের মতো জাঁকজমক আর নেই।

নরেন্দ্রনাথের পিতা ৺বিশ্বনাথ দত্ত পুরুষানুক্রমে আইন ব্যবসায়ে ঢুকলেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল। যেমন তাঁর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা তেমনি অসাধারণ মেধা। একহাতে আয় করেছেন অঢেল তেমনি অন্য দিকে ব্যয় করেছেন। দয়ার শরীরী মূর্তি। আত্মীয়

স্বজনকে পোষণ ছাড়াও বহু গরিবকে সাহায্য করতেন। তাঁর কাছে হাত পেতে কেউ বিমুখ হত না।

নরেন্দ্রনাথ বড় হলে দেখলেন তাঁর পিতার স্বভাবের সুযোগ নিয়ে বহু আত্মীয় অলস হয়ে বিলাসে মত্ত। নেশা ভাঙ করত। তিনি পিতাকে বাধা দিতে চাইলেন। এ ভাবে অর্থের অপচয় কেন ?

উত্তরে বিশ্বনাথ বলেন, 'জীবনটা যে বড় দুঃখের তা কি করে বুঝবি ? যখন বুঝতে পারবি তখন যারা নেশা ভাঙ করে তাদেরও দয়ার চোখে দেখবি।' তাঁর এই মহত্ত পরিজনের প্রতি মমত্ব সহজেই নরেন্দ্রনাথকে উদার করে তোলে। অদ্ভুত ভাবে শিক্ষা দিতেন তিনি। নরেন্দ্রনাথ একদিন বলল, 'আপনি আর আমার জন্য কি করেছেন ?'

উত্তরে তিনি আয়নার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'যা আরসিতে নিজের চেহারাটা একবার দেখগে, তা হলেই বুঝবি।'

আর একদিন মা-র সঙ্গে ঝগড়া করায় বিশ্বনাথ ছেলেকে কিছু না বলে যে ঘরে সে বন্ধুবান্ধব নিয়ে কাটাতো, সেই ঘরের দরজায় লিখে রাখলেন : নরেন আজ মা-র সঙ্গে এই ব্যবহার করেছে। পরে বহুদিন নরেন্দ্রনাথ এ ঘটনার জন্য লজ্জা পেয়েছে।

একদা নরেন্দ্রনাথ বাবাকে বলল, 'সংসারে কি ভাবে চলব ?'

উত্তর দিলেন বিশ্বনাথ, 'কখনো কোনো ব্যাপারে আশ্চর্য হয়ো না।' এর ফলেই হয়তো পরবর্তী জীবনে আপন নিভৃতে ঈশ্বরের বিকাশ দর্শনেও নরেন্দ্রনাথ স্বাভাবিক থেকেছেন। সর্বত্র সমান ভাবে দিন কাটিয়েছেন।

ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন তেজস্বিনী। অন্য মহিলারা তাঁকে তদনুসারে সম্মান করত। তাঁর পর পর চার মেয়ে হওয়ায় পুত্রের কারণে শিবের প্রার্থনা করতে লাগলেন। বহুদিন কাটল। শেষ পর্যন্ত একদিন স্বপ্ন দেখলেন, স্বয়ং মহাদেব তাঁর অবিরাম ধ্যানে সন্তুষ্ট হয়ে যোগনিদ্রা

ছেড়ে পুত্ররূপে কাছে এসেছেন। সেই অপূর্ব কান্তি মনোহর চেহারা দেখতে দেখতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল।

এর কয়েক মাস পরেই নরেন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হল।

মা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েই নির্ণিমেষ। এ কে! তাঁর চিত্ত মথিত হল বিস্ময়ে। বীরেশ্বর শিবের অর্চনায় পুত্রলাভ হয়েছে। নাম রাখা হল বীরেশ্বর। বীরেশ্বর থেকে ডাক নাম বিলে। ভাল নাম ঠিক করা হল নরেন্দ্রনাথ।

শৈশবে অত্যন্ত দুরন্ত ছিল নরেন্দ্রনাথ, যেমন ছিল জেদ তেমনি রাগ। একদিন মা বলতেন, 'শিবের কাছে এত প্রার্থনা করে ছেলে চেয়েছিলাম তিনি পাঠিয়েছেন একটি ভূত।' রাগ থামাবার জন্য মাথায় জল ঢেলে দিতেন। বলতেন, 'এমন করলে শিব আর কৈলাসে তোকে যেতে দেবে না।' নরেন্দ্রনাথের কি হত কে জানে! সমস্ত জেদ রাগ ভুলে শান্ত হয়ে পড়ত সে।

সাধু সন্ন্যাসী দেখলেই ছুটত নরেন্দ্রনাথ। তাঁকে রোধ করা তখন অসাধ্য। যেন অন্তরে কেউ ডাক দিত। সাধুদের সেবা করত সে। কেউ কিছু চাইলে তৎক্ষণাৎ এনে দিত। একবার একটা নতুন কাপড় পরে সে সমবয়সীদের সঙ্গে খেলে বেড়াচ্ছে হঠাৎ এক সন্ন্যাসী উপস্থিত। জোর গলায় 'নারায়ণ হরি' ধ্বনি শুনে ছুটে এল নরেন্দ্রনাথ। সন্ন্যাসী তার কাছে কাপড় চাইল। সেই মুহূর্তে দ্বিধাহীন চিত্তে পরনের নতুন কাপড় খুলে দিল সে। সন্ন্যাসী তাই দিয়ে পাগড়ী বানিয়ে আশীর্বাদ করে চলে গেল।

একদিন হঠাৎ নরেন্দ্রনাথ উধাও। তাকে কেউ খুঁজে পাচ্ছে না। বাড়িতে হুলুস্থূল কাণ্ড। কোথায় গেল সে? সর্বত্র খুঁজে একজন ছাদে দেখতে গেল, ছাদে এসেই সে দেখল চিলেকোঠার দরজা বন্ধ! কি ব্যাপার? বহু ধাক্কাধাক্কিতেও না খোলায় দরজা ভাঙা হল।

নরেন্দ্রনাথের তবু হুঁশ নেই। সেই ঘরে রামসীতার মূর্তির সামনে সে ধ্যানে নিমগ্ন। স্থির, নিশ্চল। শেষ পর্যন্ত ঠেলতে তার জ্ঞান ফিরল।

সন্ন্যাসী হবার সাধ তার আবাল্য। একদিন এক টুকরো কাপড় কোমরে এঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মা বললেন, 'এ কি রে বিলে?'

ছেলে বলল, 'আমি শিব হয়েছি।'

ছোটবেলা থেকেই তার ধ্যানে আসক্তি। বন্ধুবান্ধব নিয়ে ধ্যানে মাতত বিলে। চোখ বুজলে আর বাহ্যজ্ঞান থাকত না। একবার সকলে ধ্যান করছে। এমন সময় এক গোখরো সাপ সেখানে হাজির। অন্যান্য ছেলেরা তাই দেখে তো ভয়ে অস্থির। কিন্তু বিলের সাড়া নেই। ডাকলেও শুনছে না। বাবা মা-র কাছে খবর গেল। সকলে এসে এই দৃশ্য দেখে বিমূঢ়। অথচ সাপটাকে মারাও যায় না যদি ছোবল দেয়। সাপ কিন্তু আপনি অদৃশ্য হল। জ্ঞান ফিরলে সকলে তাকে সাপের কথা বলল। সব শুনে সে উত্তর দিল, 'কই আমি তো টের পাই নি।'

ছোটবেলায় আর একদিন ঘরে একা ধ্যান শেষ করে হঠাৎ একটি মূর্তি দেখে নরেন্দ্রনাথ। জ্যোতির্ময় দেবকান্তি। শরীরে বৈরাগ্যের বিভূতি। মূর্তি তার পানে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। মনে হচ্ছিল কিছু বলবে সে।

কিন্তু ভয়ে নরেন্দ্রনাথ ঘর ছেড়ে বাইরে আসায় মূর্তি অন্তর্হিত।

তার ঘুমের ব্যাপারে অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটত। বিছানায় শুয়েই ঘুম আসত না। উপুড় হয়ে শুয়ে চোখ বুজলে মনে হত দুই ভুরুর মধ্যে একটি জ্যোতির্বিন্দু জ্বলে উঠত। ঐ বিন্দু বর্ণের সুষমায় ক্রমে বিশ্বের আকারে ফেটে গিয়ে আলোর বন্যা উদ্ভাসিত। তখন সেই মায়া আলোকে ডুবে ডুবে ঘুম আসত। সারা জীবন তিনি এই জ্যোতি

দেখেছেন। যা শুনে ঠাকুর বলেছেন, 'এ হচ্ছে ধ্যান সিদ্ধের লক্ষণ।'

বাড়িতেই পাঠশালা। নরেনের লেখাপড়া শুরু হল। কিন্তু আত্মীয়ের ছেলের সঙ্গে সে পাঠ আরম্ভ করল। সকলের মধ্যে দলের দলপতি।

একবার শুনেই মুখস্ত হয়ে যেত পড়া। গুরুমহাশয় পাঠ দিতেন। চোখ বুজে শুনত সে। আর পড়বার দরকার হত না। এই অদ্ভুত স্মরণ শক্তির প্রখরতায় নরেন মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আয়ত্ব করে ফেলল। সে রাত্রে একজনের সঙ্গে শুত। তিনি সংস্কৃত কিছু জানতেন। নরেনকে শেখাবার জন্য শুয়ে শুয়ে মুগ্ধবোধ বলতেন শুনে শুনে মুখস্ত হয়ে গেল তা। তখন তার বয়েস মাত্র ছয় থেকে সাত।

বিশ্বনাথের একজন মুসলমান মক্কেল ছিল। তিনি নরেনকে খুব ভাল বাসতেন। মিঠাই সন্দেশ এনে খাওয়াতেন। দ্বীধাহীন চিত্তে নরেন তা খেত। হিন্দু মক্কেলরা এ দৃশ্যে ভয় পেত। যদিও বিশ্বনাথ উপেক্ষা করতেন। ছেলেকে কিছু বলতেন না। নরেন এ সব শুনে ব্যাপার কিছু বুঝত না। একদিন তাই জাতিভেদ কি বোঝবার জন্য সে সমস্ত হুঁকো টেনে দেখতে চাইল—আলাদা আলাদা হুঁকোর কারণ কি! কেউ ঘরে না থাকায় সুযোগ পেয়ে টানল সে। বাবা পাশেই ছিলেন। দেখে আশ্চর্য।

বিশ্বনাথ বললেন, 'কি কচ্ছিস রে?'

'দেখছি জাত না মানলে কি হয়?'

একবার পড়ে গিয়ে তার কপাল অনেকটা কেটে যায়। যার ফলে সারা জীবন কপালে একটা দাগ তাঁর নিত্যসঙ্গী, যা শুনে ঠাকুর বলতেন, 'ভাগ্যি ওখানটা ফেটেছিল নয়ত ও পৃথিবী লণ্ডভণ্ড করে ফেলত।'

নরেন্দ্রনাথের কাছে শ্রীরাম আদর্শ পুরুষ ছিলেন। রামচন্দ্রের প্রতি

প্রগাঢ় ভক্তি। রামায়ণের শ্লোক মুখস্ত করে ফেলেছে সে। কথক শুনছে নরেন। কথক বলছেন, হনুমান কদলী বনে থাকেন।

নরেন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'সেখানে গেলে তাঁকে দেখতে পাওয়া যাবে?'

কথক হেসে বললেন, 'হ্যাঁগো গিয়ে দেখ না।'

বাড়ির পাশে কলাগাছের ঝাড়। সেখানে গিয়ে চোখ বুজে বসে রইল নরেন। বহুক্ষণ অপেক্ষায়ও দেখা মিলল না। মনক্ষুণ্ণ হয়ে বাড়ি ফিরল সে। সকলে তাই শুনে বলল, 'ওরে বিলে, আজ হনুমান প্রভুর কাজে হয়তো অন্যত্র গেছে,' এ কথায় শোক কিছু কমল। ছয় বৎসর বয়সে তাঁর মুখে মহাভারত পাঠ শুনে মৃত্যুপথযাত্রী আত্মীয় বলেছিলেন, 'ভাই কালে তুই নিশ্চয়ই মস্ত লোক হবি।' এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল।

মেট্রোপলিটান স্কুলে ভর্তি হল নরেন। তখন প্রায় বয়স সাত। কিন্তু কিছুতেই সে ইংরাজী ভাষা পড়বে না। 'ও বিদেশী ভাষা, ও শিখিব কেন?'

শেষ পর্যন্ত যখন সে রাজী হল সেদিন থেকে পাঠে তার অনুরাগ দেখে সকলে বিস্মিত হল। স্কুলে পড়া কালীন নরেন খুব চঞ্চল ছিল। এক ভাবে বসে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। শিষ্যদের কাছে বলতেন, 'ছেলে বেলায় আমি খুব ডানপিটে ছিলুম তা না হলে কি আর একটা কানাকড়িও সঙ্গে না নিয়ে দুনিয়াটা ঘুরে আসতে পারতুম।' এই ডানপিটে স্বভাবের জন্য সমস্ত ছেলেরা তাকে ভালবাসত। সকলকে নিয়ে খেলাধুলোয় মেতে থাকতে পারলে আর কথা নেই। নরেন খুব ভাল ক্রিকেট খেলতে পারত। বছরের ন' মাস এ রকম খেলে কাটত। দু' তিন মাস পরীক্ষার আগে পড়ায় মন বসত। ইংরাজী ইতিহাস সংস্কৃত এ সবে খুব ভাল দখল ছিল। কিন্তু অঙ্কে মন বসত না।

সন্ন্যাস জীবনের প্রতি আসক্তি ছোটবেলা থেকেই। ক্লাসের নতুন কোনো ছেলেকে দেখলেই তাকে জিজ্ঞাসা করত নরেন, 'তাদের পূর্ব পুরুষ কেউ সন্ন্যাসী ছিল কিনা। সঙ্গীদের বলত, 'বড় হলেই আমি সন্ন্যাসী হব কত জায়গায় ঘুরে বেড়াব, কত কি করব।'

নিজের হাত দেখেও বলত, আমি যে সাধু হব এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সাত আট বছর বয়সের সময় নরেন অন্য ছেলেদের নিয়ে ওয়াজিদ আলি শার পশুশালা দেখতে মেটেবুরুজ যায়। চাঁদপাল ঘাট থেকে নৌকায় রওয়ানা হল। ফেরবার পথে একটি ছেলে অসুস্থ হয়ে নৌকায় বমি করে। মুসলমান মাঝিরা তাই দেখে বলে পরিষ্কার করতে। ছেলেরা বলে, কাউকে দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে নাও, ডবল ভাড়া দেব। মাঝিরা শুনতে চায় না। জবরদস্তি সাফ করতে বলে। গালাগালি দিতে থাকে। নৌকা ক্রমে ঘাটের কাছে এসে পড়লে নরেন্দ্রনাথ এক লাফে তীরে নেমে দু'জন ইংরেজের কাছে যায়। তারা ওখানে এমনি বেড়াচ্ছিল। ভাঙা ইংরাজীতে সমস্ত বলে—তাই শুনে তারা নৌকার কাছে চলে এল। মাঝিরা ইংরেজ দেখেই ভয় পেল। তখন সকলকে ছেড়ে দিল।

সত্যের প্রতি ন্যায়ের প্রতি সব সময় নরেন স্থিরলক্ষ্য। এরজন্য প্রয়োজনে পিতার বিরুদ্ধাচরণেও তার কোনো দ্বিধা ছিল না। বিশ্বনাথই পুত্রকে এই শিক্ষা দেন। অল্প বয়েস থেকেই ছেলের সঙ্গে গভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন তিনি। ফলে সত্যনিষ্ঠার সাহস বিচার বুদ্ধি প্রভৃতি নরেনের মধ্যে আপনি বিকশিত হয়ে উঠল। বিশ্বনাথ দত্তর হৃদয় ছিল বিরাট। সকল ধর্মের লোকই তাঁর বন্ধু ছিল। বংশমর্যাদা জাতি বা ধর্ম বাদ দিয়ে মানুষের মনুষ্যত্বই তাঁর কাছে বড়—নরেন বাল্যকালে এ-সব উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছিল। বাবার

সরল সহজ এই দৃষ্টান্ত মা-র প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা, তাকে বড় হতে প্রভূত সাহায্য করেছে। শেষ জীবনে মা-র কথায় বলতেন, 'যে মাকে সত্যি সত্যি পুজো করতে না পারে সে কখনো বড় হয় না।'

ভুবনেশ্বরী বলতেন, 'আজীবন পবিত্রভাবে সত্য পথে থাকবে নিজের মর্যাদার সঙ্গে অন্যের মর্যাদাকে রক্ষা করবে। প্রয়োজনে কঠোর হবে।'

নরেন্দ্রনাথ ছিল নির্ভীক দৃঢ়চেতা। কাউর চেয়ে নিজেকে হীন মনে করত না সে। ছেলেমানুষ ভেবে কেউ তাকে উপহাস করলে সেও ছাড়ত না। শেষ জীবন পর্যন্ত সত্য থেকে বিচ্যুত হয় নি তার মন।

চোদ্দবছর বয়সের সময় স্কুলে পড়াকালীন একবার নরেন রায়পুর বেড়াতে যায়। যাত্রাপথে গরুর গাড়িতে নৈসর্গিক শোভায় তার জ্ঞান লোপ পায়। বহু পরে চেতনা ফিরে আসে। এই বোধ হয় বিবেকানন্দর জীবনে কল্পনায় ধ্যানের প্রথম তন্ময়তা। রায়পুরে দু'বছর কাটল।

ষোল বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে নরেন্দ্রনাথ উত্তীর্ণ হল। এই সময়ে ক্রম যুবক হয়ে ওঠা মন চারদিকে নিবিষ্ট হতে লাগল। দাবাখেলা, নাটক করা, নৌকাচালান, অসিখেলা সব কিছুতেই পারদর্শী নরেন। যদিও গানেই তার অসামান্য দক্ষতা দেখা গেল। প্রত্যেক প্রতিবেশী তাকে ভালবাসত স্নেহ করত। তার তেজস্বিতা উপস্থিত বুদ্ধি গান সকলকে মুগ্ধ করে ফেলেছিল। তার বাল্যকার দেখে সকলেই বুঝেছিল গোপনে একটি অগ্নির জন্ম উন্মেষের পথে।

প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হল সে। কিন্তু একবছর বাদেই জেনারেল অ্যাসেমব্লিস ইনস্টিটিউশনে চলে গেল নরেন্দ্রনাথ। পড়াশুনায় বিশেষ মন গেল। ইংরেজীতে দক্ষতা লাভ করল সে দেখতে দেখতে। এ-সময় মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে এক শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে ইংরেজীতে বক্তৃতা দিল প্রায় যুবক নরেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

ছিলেন সভাপতি। অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন তিনি। পরে অবশ্য স্বামীজী সম্পর্কে বলেছেন।

দু'বছর বাদে এফ. এ. পাস করে কুড়ি বছরে গ্র্যাজুয়েট হল সে। শুরু হল ওকালতি পড়া। এই সময়েই পিতার মৃত্যুতে পড়াশুনো ছাড়তে হল অর্থকষ্টে পড়ে।

কলেজ জীবনে তার কাছাকাছি কোনো যুবক ছিল না। যুক্তিতে তর্কে সে সমস্ত ছাত্রের নেতা বলে পরিগণিত হল। সবাই তাকে ভয় করত। স্কুলের ডানপিটেপনা কলেজে এসে থিতিয়ে পড়ল। প্রবল পাঠে মন যাওয়ায় প্রায় সময়ই পড়ত সে। দর্শন পাঠে মন গেল। দর্শন গণিত জ্যোতিষ তার প্রিয় বিষয় ছিল। তার অসামান্য স্মৃতি-শক্তির বিকাশও হয় এ-সময়ে। ভুবনেশ্বরী দেবীও এই গুণের অধিকারী ছিলেন। মা-র কাছ থেকেই এই ক্ষমতা আয়ত্ব করেছিল নরেন। স্মৃতিশক্তির পাশাপাশি ছিল অসাধারণ মেধা। একবার কোনো কিছু পড়লে আর জীবনেও ভুলত না। ফলে অল্পসময়ে বিরাট বিষয় অধ্যয়ন ও দখল করে ফেলেছিল সে। কাব্য ইতিহাস দর্শন। ক্রমে মন সত্যলাভে ধাবিত হয়ে পড়ল। এই সত্যকে পাবার জন্য মন খুঁজে বেড়াল দর্শনের তত্ত্বে। এ-দেশী ও-দেশী সমস্ত মত। কিন্তু সত্য কোথায়! পাশ্চাত্য সমস্ত দর্শন ঘেঁটে শুধু যে-টুকু পেল নরেন্দ্রনাথ—যুগযুগান্তব্যাপী হিন্দুধর্মে বর্ণিত সত্যের সামান্য আভাস মাত্র তা, এই পাঠ, দর্শনে অগাধ বুৎপত্তি তার জীবনে অল্পসময়েই পবিত্রতা ও নির্মলতার বীজ বপন করে দিল। শেষ পর্যন্ত পবিত্রতাই তার চরিত্রের প্রধান মেরুদণ্ড হয়ে পড়ল।

একদিকে নিভৃতে দর্শনে জ্ঞানলাভ করেই প্রথম যৌবন কাটে নি।

নরেনের গান বিখ্যাত হয়ে উঠল দেখতে দেখতে। সকলে দল বেঁধে তার গান শুনতে লাগল। শরীর মন উভয়ের কোথাও জড়ত্ব অলসতা

না থাকায় কি বাইরে কি অন্তরে ক্রমশ নরেন্দ্রনাথ পূর্ণ মানুষে পরিণত হতে লাগল।

বি. এ. পরীক্ষার ঠিক কাছাকাছি সময় নরেন কঠোর ব্রহ্মচারীর মতো প্রায় দিন কাটাত। এরই মাঝে গানের আসর বসত তার পড়ার ঘরে। অর্ধেক রাত কাটত ধ্যানে-সত্যানুসন্ধানে। সন্ন্যাস জীবনের অপরিহার্য ব্রহ্মচর্য তার মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে ফুটতে লাগল। চিত্তশুদ্ধি না হলে বেদান্ত তত্ত্বে জ্ঞান হয় না এ কথা বুঝতে পেরেছিল সে।

সাধু সন্ন্যাসী দেখলে ছুটে যেত সেখানে। গল্প করত।

এমন ভাবে একই সঙ্গে ত্যাগ ও বৈরাগ্য অন্য দিকে অনাবিল আনন্দ তার জীবনের সঙ্গী হয়ে উঠল। একাধারে যেমন তিনি যোগী—অপর দিকে তেমনি শুধু ভোগী। নিষ্কাম ভাবে সমস্ত কিছু থেকে রস বা আনন্দ আস্বাদন করেছেন তিনি।

তার দর্শনে জ্ঞান সম্পর্কে সে সময়ে রেভারেণ্ড হেস্টি বলেন, আমি অনেক জায়গায় ঘুরেছি। কিন্তু এমন একটি ছাত্র দেখি নি। এমন কি জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যেও না। কালে জগতে সে নাম রাখবে।

হার্বার্ট পেনসার তার জীবনের মূলমন্ত্র যেন। দিবারাত্র পাশ্চাত্য দর্শন নিয়ে আলোচনায় নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বর বিশ্বাসে সন্দেহ করতে লাগলেন। বিদ্রোহী হয়ে উঠল মন। চারদিক থেকে চিন্তার কালোমেঘ ঘনীভূত হয়ে উঠল। যত ব্যাকুল ভাবে সত্যর প্রতি ধাবিত হল ততই বিফলে যায় সমস্ত আগ্রহ। অথচ শৈশবের বিশ্বাস থেকে হঠতেও রাজী নন।

বসণে ভূষণে বৈরাগ্য। মনের মধ্যে ত্যাগ শিকড় গেড়ে বসতে লাগল।

বাড়ির সকলে তাঁর বিয়ে দিতে চাইল। কিন্তু বার বার বাধা পেয়ে উদ্যোগ ভেঙে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বাবার মৃত্যুতে সমস্ত আয়োজন চাপা পড়ল।

এ সবে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। মনে এক চিন্তা ঈশ্বর আছে কি নেই। শুরু হল ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত। ব্রাহ্মদের বহু ধারণা তার ভাল লাগল। জাতি ভেদের হীন নীতি থেকে মানুষকে মুক্ত করা এবং স্ত্রী শিক্ষার প্রচার তাকে দলে টানল। সমাজের খাতায় নাম লেখালেন তিনি। কিন্তু অল্প দিনেই বুঝলেন বিদেশীর অনুকরণে নতুনের মোহে প্রাচীনকে ত্যাগ করার মধ্যে সার্থকতা নেই। সত্যের উপলব্ধি নেই। বরং দুইয়ের সমন্বয় একমাত্র পথ।

সমাজের সঙ্কীর্ণতা হীনমন্যতার ঊর্ধ্বে হিন্দুধর্মের প্রচারের দ্বারা জাতীয় ভাবকে প্রচার করা তাঁর আরাধ্য হয়ে উঠল।

ব্রাহ্ম সমাজ প্রথম প্রথম ভাল লাগল। ভাবলেন এখানেই ঈপ্সিত সত্যকে পাবেন। কিন্তু কই, ঈশ্বর কই? আলোকাভিসারী তাঁর মন ঈশ্বর বাসনায় পাগল হয়ে উঠল।

শেষ পর্যন্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে সটান গিয়ে হাজির হলেন একদিন। দেবেন্দ্রনাথ তখন আদর্শ পুরুষ। কেশবচন্দ্রকে আকৃষ্ট করেছেন স্বীয় পথে। নরেন্দ্রনাথ তাঁর কথা মতো কিছুদিন ধ্যান করে কাটালেন। কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত সত্য উপলব্ধি হল না।

উত্তেজিত হয়ে একদিন বলে বসলেন দেবেন্দ্রনাথকে, 'আপনি নিজে ঈশ্বর দেখেছেন কি?'

মহর্ষি এ কথার উত্তরে শুধু বললেন, 'তোমার চোখ দুটো ঠিক যোগীদের চোখের মতো দেখতে।'

সন্তুষ্ট হলেন না নরেন্দ্রনাথ। ভাবতে লাগলেন কি ভাবে ঈশ্বর লাভ হবে। তাঁর দেখা কোথায় পাব?

বই পড়ে লাভ নেই; বইর সীমাবদ্ধ জ্ঞানে ঈশ্বর লাভ অসম্ভব।

১৮৮১ সালের নভেম্বর মাস।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটল। সে বছর তিনি পরীক্ষা দেবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের এক ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র সিমলায় তাঁর বাড়িতে ঠাকুরকে নিয়ে এলেন। এই উৎসবে গান করবার জন্য নরেন্দ্রনাথের ডাক পড়ল। ঠাকুর তাঁকে দেখেই আকৃষ্ট হলেন। গান বাজনা উৎসব শেষে ঠাকুর তাকে একদিন দক্ষিণেশ্বরে যেতে বলেন। কিছুদিন বাদে তাঁর আত্মীয় রাম দত্ত বললেন, 'ধম্ম ধম্ম করে পাগল হয়ে তুই চারদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন?

প্রকৃত ধর্ম জানতে হলে দক্ষিণেশ্বরে যা—পরমহংসদেব সকল ধর্মের সার। তিনি তোকে পথ বাৎলে দেবেন।'

সুরেন্দ্রনাথ মিত্রর সঙ্গে দুই বন্ধু নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে হাজির হলেন নরেন্দ্রনাথ। তাঁকে দেখে ঠাকুরের সে কি আনন্দ। গান গাইতে অনুরোধ করলেন তিনি। নরেন্দ্রনাথ গাইলেন, 'মন চল নিজ নিকেতনে' গানের অপূর্ব সুরে ভাবমুগ্ধ হলেন রামকৃষ্ণ। গান শেষে হঠাৎ তাঁর হাত ধরে ঠাকুর তাঁকে নিভৃতে এনে বললেন, 'এতদিন পরে আসতে হয়? আমি যে তোর পথ চেয়ে বসে আছি। বিষয়ী লোকদের সঙ্গে কথা বলে ঠোঁট জ্বলে যাবার জোগাড়।' এই বলে তিনি অনন্তর কাঁদলেন। তারপর আবার জোড়হাত করে বলে উঠলেন, 'প্রভু আমি জানি তুমি কে। তুমি সেই পুরাতন ঋষি, তুমি নর নারায়ণ...' নরেন্দ্রনাথ ভাবলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ উন্মাদ—তাই চুপ করে রইলেন। একটু বাদে নিজের হাতে ঠাকুর তাকে মাখন মিশ্রি সন্দেশ খাওয়াতে শুরু করলেন। তারপর হাত ধরে বললেন, 'বল, শীঘ্র, আর একদিন একলা আমার কাছে আসবি?'

অনুরোধ ঠেলতে না পেরে কথা দিয়ে চলে এলেন নরেন্দ্রনাথ।

বাড়িতে ফিরে বার বার ভাবলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। ভগবৎ প্রেমে উন্মাদ। দু' একদিনের মধ্যে যাওয়া আর হয়ে উঠল না।

এক মাস পর একা নরেন্দ্রনাথ এলেন দক্ষিণেশ্বরে। ছোট তক্ত-পোশের উপর বসে শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে দেখে হাত ধরে খুশি হয়ে কাছে বসালেন। ভাবে বিভোর হয়ে কি সব বলতে লাগলেন। নরেন্দ্রনাথ ভাবলেন—পাগলের খেয়াল। হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ তার দক্ষিণ পা দিয়ে নরেন্দ্রনাথকে ছুঁতেই তাঁর কি হয়ে গেল। মনে হল এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, প্রচণ্ড বেগে ঘুরছে—ঘুরতে ঘুরতে শেষ হয়ে যাবে আকাশে—অস্তিত্ব বুঝি এখনই লোপ পাবে। ভয়ে বিস্ময়ে কেঁদে

উঠলেন নরেন্দ্রনাথ, 'ওগো এ তুমি আমার কি করলে, আমার যে বাবা মা আছেন।'

এই শুনে ঠাকুর তার বুকে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'তবে এখন থাক, সময়ে সব হবে।'

নরেন্দ্র ভেবেছিলেন ঠাকুর সম্মোহন বিদ্যা জানেন, এ তারই ফল। কিন্তু নিজের মানসিক দৃঢ়তার পর তাঁর বিশ্বাস ছিল, দুর্বল মনের লোকরাই সম্মোহনে বশ হয়। তবে কি!

এক সপ্তাহ পরে আবার এলেন তিনি।

বাগানের মধ্যে সমাধিস্থ ঠাকুর। সমস্ত লক্ষ্য করলেন নরেন্দ্রনাথ। সচেতন হয়েই ঠাকুর এসে তাঁকে আবার আগের দিনের মতো ছুঁলেন। সতর্ক ছিলেন তিনি। তবু অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। জ্ঞান হলে দেখে ঠাকুর তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

আঠারো বছর বয়স থেকে ঠাকুরের সান্নিধ্যে নরেন্দ্রনাথের যাতায়াত শুরু হয়। তখনও তিনি পুরোপুরি তাঁকে বিশ্বাস করতে পারেন নি। পরমহংসদেবের মধ্যেকার মহাপুরুষ চরিত্রকে বুঝে উঠতে পারেন নি। পাগল বলে ধরে নিয়েছেন। এ দিকে তাঁর অন্বিষ্ট সত্যর দেখাও কিছুতে পাচ্ছেন না। স্বয়ং মহর্ষি বলেন, তিনি ঈশ্বর দেখেন নি। শেষ পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথ একদিন স্থির করলেন এ বিষয়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করব, দেখি কি বলেন।

দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে প্রশ্ন করলেন নরেন্দ্রনাথ, 'আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন?' পরমহংসদেব তক্ষুনি জবাব দিলেন, 'হ্যাগো, এই যেমন তোমায় দেখছি।' শুধু তাই নয়; বললেন যে দরকার হলে তাঁকে দেখাতেও পারেন।

ইংরেজী শিক্ষার ফলে প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস করেন নি তিনি। যুক্তি দিয়ে তর্ক দিয়ে অস্তিত্ব দিয়ে বুঝতে চেয়েছেন। ক্রমশ রামকৃষ্ণ-

দেবের প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, তন্ময়তা তাঁকে আগুনের মতো আকর্ষণ করল। শেষ পর্যন্ত ঠাকুরের সব কথাই তিনি সত্য বলে জানলেন, এই ভাবে মেনে নিতে পাঁচ বছর সময় লেগেছিল।

বি. এল. পড়ছিলেন নরেন্দ্রনাথ।

জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবেন। ঠাকুরের চরণে হৃদয় দিয়েছেন। সংসারে তখনো লক্ষ্য পুরোপুরি বিনষ্ট হয় নি। বাবা-ঠাকুরদাদার ব্যবসা গ্রহণ করবেন। এমন সময় হঠাৎ একদিন তাঁর পিতৃদেব পরলোকগমন করে অকূলে ফেলে গেলেন তাঁকে। পড়াশুনোয় ছেদ পড়ল। বিশ্বনাথ দত্ত পুত্রের জন্য কিছুই রেখে যান নি; উপরন্তু নরেন্দ্রনাথের মাথার উপর ঝুলছে ঋণের বোঝা।

সংসার অচল হয়ে পড়ল। আত্মান্বেষণ ঈশ্বর চিন্তা মন থেকে পলাতক প্রায়—চাকরি চাকরি করে ঘুরছেন নরেন্দ্রনাথ। দিবারাত্র অন্ন চিন্তা। এতৎসত্ত্বেও একদিনের জন্য মনোবল হারান নি তিনি। দারিদ্র্যের সুযোগে যে সব নীচতা অবিরাম মানুষকে লোভের পথ নির্দেশ করে জীবনকে নৈরাশ্যে ভরিয়ে তোলে নরেন্দ্রনাথ তা জয় করলেন অক্লেশে। এ সময় একদিন তাঁর কতিপয় বন্ধু জোর করে তাঁকে পাপের পথে চালিত করতে চায়। এক উদ্যান বাটীতে তাঁর সামনে সুরা ও নারী এনে উপস্থিত করে। বলে, এই দুঃসময় ভাবনার হাত থেকে রেহাই পেতে এ ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু সেই বারবনিতাকে নিভৃতে নরেন্দ্রনাথ এমন সব দরদী প্রশ্ন করলেন যাতে নারীর স্বাভাবিক ব্রীড়ায় তাড়িত হয়ে সেই রমণী স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। লোক মুখে

এ ঘটনা ঠাকুরের কানে যায়। তিনি বলেন, 'আমি জানি তার জীবনে নারী সঙ্গ হবে না।'

কিছুতেই স্থায়ী কোনো কাজ তাঁর ভাগ্যে জুটল না। অভাব শত হস্ত হয়ে যেন পেছনে তাড়া করেছে। এ সময় এক পারিবারিক মামলায় সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন নরেন্দ্রনাথ। দিন আর চলে না। শেষ পর্যন্ত কষ্ট সহ্য করতে না পেরে একদিন নরেন্দ্রনাথ ছুটে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরের পদতলে পড়লেন। আকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি করি বলুন, কি করি? কোনো আশা দেখছি না। আপনি মা কালীকে বলে একটা উপায় করে দিন।'

ঠাকুর তাঁকে স্বয়ং গিয়ে প্রার্থনা করতে বললেন। বার বার বলায় নরেন্দ্রনাথ মন্দিরে গেলেন। ভেতরে গিয়ে তাঁর কি হয়ে গেল। সামনে সাক্ষাৎ চৈতন্যময়ী ভবতারিণী। বরাভয়দাত্রী জগজ্জননী। দেবীর পাদপদ্মে নিবেদিত প্রণাম রেখে বর চাইলেন, 'আমাকে বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান ভক্তি।' টাকা পয়সার কথা বিলুপ্ত মন থেকে। বেরিয়ে আসতেই ঠাকুর বললেন, 'কিরে মাকে বললি!' উত্তর দিলেন নরেন্দ্রনাথ, 'না ভুলে গেছি।' 'তবে আবার যা।' পুনরায় একই ফল হল। বার বার তিন বার। তিন বারই জ্ঞান ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য প্রার্থনা করে ফিরে এলেন নরেন্দ্রনাথ। যে অর্থের জন্য এই ব্যাকুলতা—তার প্রতি আসক্তি কোথায় অন্তর্হিত। শেষ পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুর বললেন, 'যা মা-র ইচ্ছায় মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হবে না।'

পিতার মৃত্যুর পর তিন বছর সংসারে ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। যখন বুঝলেন, তাঁকে বাদ দিয়েও সংসার চলবে তখন ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু একদিনের জন্যও মাকে ভোলেন নি। মা তাঁর কাছে সাক্ষাৎ ঈশ্বরী—যখন কলকাতায় থাকতেন, মাঝে মাঝে গিয়ে মাকে দেখে আসতেন।

নরেন্দ্রনাথের প্রতি ঠাকুরের ভালবাসা গভীর ছিল। নরেন্দ্রনাথ যখন মনে মনে স্থির করেন সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন—তখন ঠাকুর একদিন টের পেয়ে তাঁর বিয়োগ ব্যথায় অধীর হয়ে উঠলেন। তাঁকে কাছে ডেকে বললেন, 'জানি তুমি মা-র কাজের জন্য এসেছ, সংসার তোমার জন্য নয়—কিন্তু যতদিন আমি আছি ততদিন আমার জন্য থাক।' অন্যদের কাছে বলতেন, 'জাত পুরুষ, এত ভক্ত আসছে কিন্তু ওর মতো একটিও না। কেশবের যদি একটা শক্তি থাকে, তবে নরেনের তেমন আঠারোটা শক্তি আছে।'

নরেন্দ্রনাথ প্রাথমিক বোধে এই পরম গুরুকে আধ পাগলা ধরে নিয়েছিলেন তথাপি তখন থেকেই এমন অদ্ভুত চরিত্র অসামান্য ঈশ্বরপ্রেম ও তত্ত্বজ্ঞানে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। ঠাকুর বুঝেছিলেন, একে দিয়ে সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরায় প্রসার হবে। তাই তিনি প্রগাঢ় যত্নের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের মন থেকে সমস্ত সংশয় দূর করেন। নরেন্দ্রনাথও প্রতি পদে গুরুকে ওজন করে তবে তাঁর মত মেনে নিয়েছিলেন।

ক্রমশ নরেন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন বই পড়ে ধর্মজ্ঞান আয়ত্ব হয় না। আসল ধর্মবোধ অনুভূতিতে কাজ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন সাক্ষাৎ বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রের ভাষ্য। কাশীপুরে যখন ঠাকুর অসুস্থ তখন নরেন্দ্রনাথ এ-কথা সত্য বলে ধরে নেন। তখন তাঁর অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য, মনে ঘোর অশান্তি। দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে ধুনি জ্বালিয়ে তাঁর সাধনা চলছিল। কাশীপুর থেকে রোজ রাত্রে দক্ষিণেশ্বর যেতেন। সংশয় কাটছিল। দৈবীশক্তির স্বাদও পেলেন তিনি। একদিন অভেদানন্দকে হাত স্পর্শ করতে বলায় এবং হাতে ছোঁয়া লাগতেই যেন শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেল। বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে অন্তর্সুখ পেলেন তিনি।

রামকৃষ্ণদেবের রোগশয্যায় অক্লান্ত সেবা করে যাচ্ছেন। সঙ্গে অন্যান্য গুরুভাই। এই সময়ে গুরুর আদেশে সকলে ভিক্ষা করতে যেতেন

এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত যুবক ভক্তকে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত করে গেরুয়া দিলেন।

কাশীপুরের বাগান তীর্থ হয়ে উঠল। নানা লোক আসত। ঠাকুর সেই সব ভক্ত সমাগমের মাঝে সকলকে শিক্ষা দিতেন।

একবার শিবানন্দ ও অভেদানন্দকে সঙ্গে নিয়ে নরেন্দ্রনাথ বুদ্ধ গয়া দেখতে যান। তথাগতর ধ্যানস্থল দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে এল। ধ্যান করতে করতে হঠাৎ তিনি অভেদানন্দর গলায় হাত দিলেন। বোধ হয় ধ্যানে তথাগতকে উপস্থিত মনে করে তাঁর চরণে হাত দিচ্ছেন ভেবে অভেদানন্দর গলা জড়িয়ে ধরেন।

নরেন্দ্রনাথ কাশীপুরে বার বার শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নির্বিকল্প সমাধি অবস্থা লাভের জন্য বাসনা করতেন। রামকৃষ্ণ বলতেন, 'আমি সুস্থ হই, যা চাস তুই তাই দেব।'

'কিন্তু আপনি যদি আর ভাল না হন, তবে আমার কি হবে?'

নরেন্দ্রর প্রশ্ন শুনে তিনি অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, 'শালা বলে কি?' পরে বলেন, 'আচ্ছা তুই কি চাস বল?'

'ক্রমাগত সমাধিতে ডুবে থাকি...'

'ছিঃ ছিঃ তোর মুখে এই কথা—' ঠাকুর ভর্ৎসনা করে বললেন, 'তুই কোথায় বিশাল বটগাছ হবি, যার ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে—তা না তুই নিজের মুক্তি চাস?'

একদিন সত্যিসত্যিই নির্বিকল্প সমাধি লাভ তাঁর হল। ধ্যান করতে করতে চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'গোপালদা আমার শরীর কোথায় গেল?'

কেউ কিছু বুঝতে পারল না। সকলে শ্রীরামকৃষ্ণকে খবর দিলেন। তিনি শুনে বললেন, 'বেশ হয়েছে, থাক কিছুক্ষণ ওই ভাবে; এর জন্য আমায় জ্বালাতন করে তুলেছিল।'

এক প্রহর রাত কাটলে সমাধি ঘোর কাটল।

১৮৮৬ সালের ১৬ই আগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণ দেহ রাখলেন। তার ক'দিন আগে থেকেই নরেন্দ্রনাথকে ডেকে দরজা বন্ধ করে দু'তিন ঘণ্টা কথা বলতেন। তিন চার দিন আগে ঠাকুরের সামনে গিয়ে বসতেই তিনি অনুভব করলেন যেন বিদ্যুতের মতো শ্রীরামকৃষ্ণর তেজ একটি জ্যোতির্লেখায় প্রলম্বিত হয়ে তার দেহে ঢুকল। বাহ্যজ্ঞান ফিরলে ঠাকুর বললেন, 'আজ তোকে সব দিয়ে ফতুর হলুম।'

দুদিন আগে শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে বলেন, 'দেখ নরেন, তোর হাতে এদের সকলকে দিয়ে যাচ্ছি। কারণ তুই সবচেয়ে শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান। এদের ব্যবস্থা করবি।'

নরেন্দ্রনাথ বলেন, 'আমি পারব না।'

ঠাকুর বললেন, 'করতেই হবে, তোর ঘাড় করবে।' শেষ মুহূর্তে নরেন্দ্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে ভগবানরূপী পরমপুরুষ বললেন, 'এখনো তোর জ্ঞান হল না, যে রাম সেই কৃষ্ণ, ইদানীং এ শরীরে শ্রীরামকৃষ্ণ।'

এর দুদিন পর ঠাকুর দেহত্যাগ করেন।

রামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরও কিছু দিন কাশীপুরে ভক্তরা ছিলেন। একদিন বাগানে অন্য একজন গুরু ভাইর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে নরেন্দ্রনাথ গুরুদেবের দর্শন পান। চোখের ভুল ভেবে তিনি কিছু বললেন না। কিন্তু গুরুভাই বললেন, 'নরেন দেখ দেখ।'

কাশীপুর বাগান বাটী ছেড়ে দিয়ে বরাহনগর মঠ প্রতিষ্ঠা হল। ১৮৮৬ সালের আগস্ট থেকে মঠ গড়ে উঠছিল। সন্ন্যাসীদের যে কোনো একজন এখানে থাকত। কেউ কেউ তীর্থ ভ্রমণে যেত। নরেন্দ্রনাথ এই দলের একজন। মাঝে মাঝে গৃহে যেতেন আবার ফিরে আসতেন। যদিও মঠ পরিচালনা থেকে অন্যান্য সব ব্যবস্থা তিনিই করতেন। গৃহাভিলাষী যুবকদের পুনরায় নিয়ে আসতেন। তাদের

বোঝাতেন। যাঁরা তখনো সংসার বা বৈরাগ্য কোন পথ গ্রহণ করবে স্থির নিশ্চয় নয়, তাদের বার বার বোঝাতে বোঝাতে শেষ পর্যন্ত সকলে বৈরাগ্য পতাকার নিচে সমবেত হল। সন্ন্যাসীর কঠোর জীবন নরেন্দ্রনাথের আশ্রয় হল। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করে এ সময় থেকে তিনি নিজেকে সুদৃঢ় করে গড়ে তুললেন। যাতে ত্যাগের পথের অসহ্য দহন অন্যকে ব্যাকুল না করে সেই নিমিত্ত নিজে অক্লান্ত পরিশ্রমী হলেন। ক্রমে ক্রমে সকলের মনকে অটল করে তুললেন।

১৮৮৬ থেকে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত মঠ বরাহনগরে ও ১৮৯২ থেকে ১৮৯৭ পর্যন্ত আলমবাজারে ছিল। শেষ পর্যন্ত বেলুড়ে মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। মঠ জীবন শুরু হওয়ার পর থেকে সকল যুবকের মনে ভাই ভাব ও ভালবাসা গাঢ় হতে থাকে। দিন দিন তারা অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে শক্তিতে সিদ্ধিলাভ করে। আহার নেই, পরিধেয় নেই, শুধু হৃদয়ে দুর্বার মন্ত্র মাত্র নিয়ে সাধনায় নিবিষ্ট তাঁরা।

বরাহনগর মঠে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবিরাম সংকীর্তন চলত। ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে সকলে মত্ত ঈশ্বর চিন্তায়। নরেন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন, 'বরাহনগরে এমন কতদিন গেছে যে, খাবার কিছুই নেই, জপ ধ্যানের প্রবল তোড়ে আমরা তখন ভাসছি। সে কঠোরতায় ভূত পালিয়ে যেত, মানুষের কথা কি!'

নিজেদের হাতে সব কাজ করতে হত। তার মধ্যেই দিন-রাত ধর্মালোচনা, দর্শন নিয়ে মাতামাতি। এই সময়ে নরেন্দ্রনাথ চব্বিশ ঘণ্টাই কাজ করতেন। কাজে পাগল হয়ে যেতেন। ব্রাহ্ম মুহূর্তে ঘুম থেকে উঠে গান গেয়ে সকলকে ওঠাতেন। তারপর স্তব পাঠ ভজন ইতিহাস আলোচনা। সারা দিনমান এইরূপ। সন্ধ্যায় ঠাকুরের আরতি হত।

প্রথমদিকে অন্যান্য গুরুভাইরা প্রচারের বিরোধী ছিল। নিজেদের উদাহরণ দিয়ে রামকৃষ্ণের বানীকে প্রচার করে অন্যকে উৎসাহিত করবেন,

বিবেকানন্দ প্রথম সকলের মনে এই চিন্তাকে সঞ্চার করলেন। তিনি বলতেন, 'প্রচারের অর্থ প্রকাশ।'

বরাহনগরে স্বামী বিবেকানন্দের গতিবিধি দেখলে বোঝা যেত তিনি তপস্যার আগুনে পুড়ে অঙ্গার হবার জন্যই আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর অন্তরের অদম্য ঈশ্বর কামনা যেন দেহ ভেদ করে বেরিয়ে আসত। রোজ সন্ধ্যায় ধ্যানে বসতেন। অনড় অচল একটি দেহ। সমস্ত রাত আত্মচিন্তায় প্রোথিত। সকালে যখন উঠতেন তখন মুখমণ্ডলে এক দিব্য বিভা—হৃদয়ে অনাবিল প্রশান্তি।

সকলেই তাঁর অনুসরণ করত। ঈশ্বর চিন্তায় কাটাত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বিবেকানন্দ তা দেখে তাদের শারীরিক ক্ষতিতে ব্যাকুল হয়ে বলতেন, 'তোরা কি সকলেই রামকৃষ্ণ পরমহংস হবি নাকি? তা হয় নারে। রামকৃষ্ণ পরমহংস পৃথিবীতে একটাই জন্মায়—একবারই আসে।'

এ-ছাড়া মঠে ঠাকুরের পূজা হত মন্ত্রপাঠ সহযোগে। বিবেকানন্দই তার প্রবর্ত্তক।

সাধন-ভজনের সঙ্গে কর্মের প্রতি নজর ছিল বিবেকানন্দের। ধর্ম সঙ্গীত, দর্শন, ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান, সাহিত্য সমস্ত বিষয় নরেন্দ্রনাথ গুরুভাইদের নিয়ে আলোচনা করতেন। বোঝাতেন। সকলে প্রতিপক্ষ হয়ে একা তাঁর সঙ্গে তর্কে নামত। তিনি যুক্তির বহুবিধ প্রমাণে তাঁদের পরাস্ত করে আবার তাঁদের পক্ষ নিতেন। কথায় কথায় বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুধর্মের উপর—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের প্রভাব ও উপদেশের মূল্য বোঝাতেন, 'এমন দিন শীঘ্র আসবে, যেদিন তোরা বুঝতে পারবি যে লুপ্তপ্রায় হিন্দুধর্মকে বাঁচাবার জন্য পরমহংসদেব কি করেছেন।'

কিন্তু সন্ন্যাসীরা শুধু পড়াশুনা নিয়েই ব্যস্ত ছিল না। আরো একটি জিনিসের প্রসার দেখা দিল বিবেকানন্দর শিক্ষায় এবং প্রভাবে। তা

সেবাধর্ম। নিজেরা না খেয়েও দরিদ্রদের খাওয়ানো গৃহী ভাইদের রোগে অক্লান্ত সেবা পুরোদমে চলতে লাগল।

কিছুদিন পর মঠের প্রায় সন্ন্যাসীর মনেই নির্জনতা বোধ ব্যাপ্ত হতে লাগল। সকলেই তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে। আবার ফিরে আসে। বিবেকানন্দও বহু দিন থেকে গোপনে এই বাসনা পোষণ করতেন। কিন্তু মঠ ভেঙে যাবে এই ভয়ে কাউকে কিছু বলতেন না। দেখতে দেখতে বাসনা প্রবল হতে লাগল। তখন তিনি আর তা দমন করতে না পেরে বেরিয়ে পড়লেন। প্রথম দিকে দু'-একদিনের জন্য কাছে-পিঠে ঘুরে আবার ফিরে আসতেন। প্রত্যেকবারই বলে যেতেন, 'এই যাচ্ছি আর ফিরছি না।' শেষ পর্যন্ত এসে পড়তেন। ১৮৯১ সালে প্রায় একক ভাবে তিনি ভ্রমণ শুরু করেন। তখন কেউ তাঁর খোঁজ পায় নি। পাছে ধরা পড়েন তাই নাম পালটে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। পথে মাঝে হয়তো কারো সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তারপর আবার উধাও।

প্রবজ্যাকালে তিনি নিজেকে নিজের জ্ঞানকে যথাসম্ভব আড়াল করে সাধারণ সাধুর মতো ঘুরতেন। একবার প্রতিজ্ঞা করলেন, কারো কাছে ভিক্ষে চাইব না, জুটলে তবে খাব। ফলে একসঙ্গে পাঁচদিন পর্যন্ত না খেয়ে থেকেছেন। কতদিন ভাঙা দেবদেউলে জঙ্গলে গুহায় রাত কাটিয়েছেন। সম্বলের মধ্যে পরিহিত গেরুয়া, একখণ্ড গীতা। হাতে দণ্ড ও কমণ্ডুল। প্রবজ্যার প্রতি মনস্থির করে প্রথমে কাশী যান। কাশী থেকে সারনাথ। কাশীতে তাঁর পেছনে একবার বাঁদর তাড়া করে। ভয়ে তিনি দৌড়তে থাকেন। বাঁদররা তাঁকে ধরে ধরে। তখন পেছন থেকে একজন বলল, 'থাম থাম, বাঁদরদের সামনে দাঁড়াও।' স্বামীজীর বুদ্ধি এ কথায় ফিরে এল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে বাঁদরদের তাড়া করতেই তারা পালিয়ে গেল। একটি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী কাছে

এল। স্বামীজী তাঁকে অভিবাদন করলেন, প্রত্যাভিবাদন করে সন্ন্যাসী চলে গেলেন।

এ-কথা উল্লেখ করে তিনি আমেরিকায় একটি ভাষণে বলেছেন, এ ভাবেই প্রকৃতি মায়া অবিদ্যা প্রভৃতির মুখোমুখি হতে হয়। ভয় পেয়ে কাপুরুষের মতো পালালে চলবে না।

কাশীতে তিনি ত্রৈলঙ্গ স্বামীর দেখা পান। দেখা করলেন ভাস্করানন্দ স্বামীর সঙ্গে। কাশী থেকে অযোধ্যা হয়ে আগ্রা গেলেন। আগ্রা থেকে বৃন্দাবন। কপর্দকশূন্য অবস্থায় বৃন্দাবন পৌঁছলেন। রাস্তার শ্রমে ক্ষিধেয় কাতর হয়ে পড়েছেন। দেখলেন অদূরে একজন লোক তামাক খাচ্ছে। স্বামীজী তার কাছে গিয়ে তামাকের কলকে চাইলেন। লোকটি ব্যস্ত হয়ে বলল, 'আমি যে জাতে মেথর।' ওর কথা শুনে নিরাশ হয়ে তিনি কিছুদূর গেলেন। হঠাৎ তার মনে হল, ছি ছি এখনো সংস্কার। ফিরে এসে পুনরায় তার কাছ থেকে তামাক চেয়ে খেলেন।

বৃন্দাবনে একবার বৃষ্টির মধ্যে তিনি পথ হাঁটছেন। মনের প্রতিজ্ঞা কাউর কাছে ভিক্ষা চাইবেন না। কাতর হয়ে পড়েছেন পরিশ্রমে আর ক্ষুধায়। এমন সময় পেছন থেকে কে যেন ডাকল। স্বামীজী গ্রাহ্য না করে চলতে লাগলেন। লোকটিও পেছনে আসছিল। স্বামীজী দৌড়লেন। সেও পশ্চাতে ধাবিত হয়ে সামনে বহু আহারের সামগ্রী নিবেদন করল। এ ব্যাপারে তিনি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। রাধাকুণ্ডেও এমনি এক ঘটনা ঘটে। একখানা মাত্র কৌপীন থাকায় তা ধুয়ে কুণ্ডের জলের ধারে রেখে তিনি উলঙ্গ হয়ে স্নান করলেন। স্নান শেষে দেখলেন, বাঁদরে কৌপীন নিয়ে একটি গাছের ডালে বসে আছে। অনেক চেষ্টার পর শতছিন্ন কৌপীন ফেরৎ পেলেন তিনি। এতে তাঁর অভিমান হল কুণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী রাধারাণীর উপর। প্রতিজ্ঞা করলেন লোকালয়ে যাবেন না। দেখি ভক্তের জন্য দেবতা

জঙ্গলে কি ব্যবস্থা করেছেন। পাশের জঙ্গলের রাস্তা ধরতেই পেছন থেকে কে ডাকল। তিনি কান না দিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটছেন। লোকটি দৌড় শুরু করল। স্বামীজীও দৌড় লাগালেন। বহুকষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে লোকটি তাঁকে ধরে নিজের বাড়ি নিয়ে পরিতৃপ্ত সহকারে খাইয়ে নতুন বস্ত্র দান করল।

বৃন্দাবন থেকে হাতরাস। এখানে শরৎ গুপ্তর সঙ্গে তাঁর পরিচয়। শরৎ গুপ্ত স্টেশন মাস্টার। হঠাৎ তিনি স্বামীজীকে আসন-পিড়ি অবস্থায় বসা দেখতে পান। এত সুন্দর সাধু দেখেন নি। দেখেই বুঝলেন সন্ন্যাসী অভুক্ত। অনুমতি নিয়ে খাবার এনে দিলেন। পরে হাতের কাজ সেরে আলাপ করলেন।

স্বামীজীর কাছে তিনি শিক্ষা চাইলেন।

তখন তিনি কোনো জবাব দেন নি। পরে বলেন, 'ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান মনে রেখ, এতেই তোমার উন্নতি হবে। মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।'

শরৎবাবু ছাড়বেন না। তিনি সঙ্গ নিতে প্রস্তুত, শিষ্য হবেন।

'সত্যই তুমি যাবে?'

শরৎবাবু মাথা নাড়লেন। তিনি যাবেন।

স্বামীজী বললেন, 'তবে এই ভিক্ষাপাত্র নিয়ে কুলিদের কাছ থেকে ভিক্ষে নিয়ে এস দেখি।'

কথা মতো ভিক্ষা করে আনলেন তিনি। বাধ্য হয়ে তাকে শিষ্য করলেন বিবেকানন্দ। উভয়ে একসঙ্গে হৃষীকেশ গেলেন।

সাধারণ সাধুর মতো হৃষীকেশে দিন কাটত। হৃষীকেশে শরৎ গুপ্ত অসুস্থ হয়ে পড়ায় আবার হাতরাসে ফিরতে হল। হাতরাসে এসে স্বামীজী নিজে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কেউ হয়তো এখান থেকে বরাহনগরে তাঁর খবর দেয়। সেখান থেকে তাঁকে ফিরবার জন্য সবাই

অনুরোধ করে চিঠি লেখে। সদানন্দ স্বামীকে (শরৎ গুপ্ত) সঙ্গে নিয়ে কলকাতা চললেন। ক'মাস মঠে কাটল। তারপর আবার তিনি পথে বেরিয়ে পড়লেন।

এবার প্রথমেই গাজীপুর। গাজীপুরে পওহারী বাবা নামে এক অসাধারণ যোগী পুরুষ ছিলেন। এখানে স্বামীজী হিন্দুধর্মের উপর নানা কথা বলেন। তিনি বলেন, 'কি গভীর এই হিন্দুধর্ম—বৈদেশিক শিক্ষার মোহে জাতটাকে ভুলো না। প্রকৃত শিক্ষায় হিন্দুধর্ম আলোকিত হয়, তাকে চেনা যায়।' এখানে রস সাহেবের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। রস সাহেব হোলি পর্ব সম্পর্কে জানতে চাইলে স্বামীজী তাঁকে ব্যাখ্যা করে বসন্তোৎসবের উদ্দেশ্য বোঝান। একটি প্রবন্ধ লিখে দিলেন। রস সাহেব ছাড়া মিস্টার পেনিংটন, কর্নেল রিভেট কার্নাক নামে আরো দুই ইংরাজ সাহেব তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়। পওহারী বাবার সঙ্গে মিলিত হবার আগ্রহ সত্ত্বেও বিবেকানন্দ তাঁর দেখা পেলেন না। ফিরে গেলেন বরাহনগরে।

১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বৈদ্যনাথ ধামে ছিলেন তিনি। খবর এল এলাহাবাদে স্বামী যোগানন্দ অসুস্থ। শুনেই ছুটে গেলেন। মিলিত হলেন গুরুভাই নিরঞ্জনানন্দ ও সদানন্দর সঙ্গে। যোগানন্দ সকলের সেবায় সুস্থ হয়ে উঠলেন। এখানে একদিন এক মুসলমান ফকিরকে তিনি দেখতে পান। যাঁর চেহারা দেখে হুবহু শ্রীরামকৃষ্ণর চেহারা মনে পড়ে যায়। এলাহাবাদ থেকে কাশী হয়ে ১৮৯০ সালে আবার তিনি গাজীপুরে এলেন। মুখ্য উদ্দেশ্য পওহারী বাবার দর্শন লাভ। কয়েকদিন ঘুরে ঘুরে অবশেষে দেখা পেলেন। তাও চাক্ষুস দেখা নয়। দরজার পাশ থেকে আলাপ হল। পওহারী বাবা বললেন, 'যন সাধন তন সিদ্ধি।'

স্বামীজী প্রশ্ন করলেন, 'তিতিক্ষা ক্যায়সে বনে?'

উত্তর এল, 'গুরুকা স্মরমে নৌকা মাফিক পড়া রহো।'

স্বামীজী আনন্দিত হলেন এই আলাপে। পওহারী বাবা অদ্ভুত রাজযোগী। তদুপরি তিনিও শ্রীরামকৃষ্ণর ভক্ত। তাঁর গুহায় ঠাকুরের একটি ছবি সযত্নে রক্ষিত। ছবিটি দেখিয়ে স্বামীজীকে বলেন তিনি, 'ইনি সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার।' বিবেকানন্দ স্থির করলেন পওহারী বাবার কাছে দীক্ষা নেবেন। বাবাজীও রাজি হলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! স্থির নির্দিষ্ট দিনে গুহার দিকে যাচ্ছেন তিনি। হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে তাকে টেনে ধরল। পা অচল, দেহ অবশ। অন্তরে অভিমান উথলে উঠল। বিস্ময়ে ভাবলেন, এমন হল কেন?

তবু সংকল্প ছাড়লেন না। আবার দিন স্থির করলেন। বিশ্বাস অটল।

আগের দিন রাত্রে অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। পওহারী বাবার গুহায় লেবু বাগানে একা খাটিয়ায় তিনি শুয়ে আছেন। নানা কথা ভাবছেন। এমন সময় হঠাৎ সামনে শ্রীরামকৃষ্ণর চেহারা সমস্ত আলোকিত করে তুলল। তাঁর চোখে ছলছল দৃষ্টি। স্বামীজীর মুখে চেয়ে আছেন। হঠাৎ আত্মগ্লানিতে মন ছেয়ে গেল। আমি কি অবিশ্বাসী, অকৃতজ্ঞ! মুখে কথা নেই। শরীরে স্বেদ বিন্দু দেখা দিল। অবশেষে তিনি বলে উঠলেন, 'না না তা কখনো হয় না এ হৃদয়ে অন্য কারো স্থান নেই—জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ।'

গাজীপুর থেকে স্বামীজী খবর পেলেন অভেদানন্দ হৃষীকেশে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁকে কাশী আনানো হল। কাশী গেলেন বিবেকানন্দ।

এই সময়ে বলরামবাবু দেহত্যাগ করেন। খবর পেয়ে কেঁদে ফেললেন স্বামীজী। তাই দেখে প্রমদাবাবু বলেন, 'আপনি কাঁদছেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে শোক প্রকাশ অনুচিত।'

উত্তরে তিনি বলেন, 'সন্ন্যাসী হয়েছি বলে হৃদয় বিসর্জন দেব কেন ? হাজার হলেও আমি মানুষ।'

মধ্যে একবার কলকাতা ফিরে আবার ১৮৯০ সালের জুলাই মাসে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। সাত বছর মঠে ফিরলেন না। মনে বাসনা হিমালয় দর্শন। প্রথমে ভাগলপুর এলেন। তারপর বৈদ্যনাথ ধাম। এখানে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচারক রাজনারায়ন বসু ছিলেন। সেখানেই উঠলেন। বৈদ্যনাথ থেকে কাশী হয়ে অযোধ্যায়। অযোধ্যায় মোহান্ত জানকীবর শরণের সঙ্গে দেখা হল। তাঁর দর্শনে স্বামীজী প্রীত হলেন।

হিমালয়ের দিকে যাত্রা শুরু হল। প্রথমে নৈনিতাল। নৈনিতালে বদরিকা আশ্রম দেখে মুগ্ধ হলেন তিনি। আশ্রমের নির্জনতা তাকে ধ্যানমগ্ন করে ফেলল। ধ্যানান্তে এক নতুন বিশ্বাস তাঁর মনে জন্ম নিল। প্রতি পরমাণুতে বিশ্ব-সংসার বিদ্যমান তা তিনি প্রত্যক্ষ করলেন।

আলমোড়ায় পরিশ্রান্ত হয়ে রাস্তায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন স্বামীজী। সঙ্গে অখণ্ডানন্দ স্বামী। তিনি জলের খোঁজে গেলেন। এক মুসলমান ফকির এই অবস্থা দেখে স্বামীজীকে শশা খেতে দিল। শশা খেয়ে সামান্য সুস্থ হলেন। আলমোড়ায় অন্য দুই গুরু ভাইর সঙ্গে দেখা হল। সারদানন্দ ও কৃপানন্দ। এঁরাও হিমালয় ভ্রমণে বেরিয়েছিল। আলমোড়ায় থাকাকালীন এক বোনের মৃত্যু সংবাদ পেলেন। দুঃখ পেলেন অন্তরে। কিন্তু সন্ন্যাসীর কঠোরতা দিয়ে তা দমন করলেন। বাড়ির লোক তাঁর খোঁজ পেয়েছে দেখে আলমোড়া ত্যাগ করলেন সঙ্গে সঙ্গে।

যাত্রা শুরু হল। কর্ণপ্রয়াগের পথে ভীষণ জ্বরে পড়লেন। তিনদিন এক চটিতে কাটিয়ে আবার চললেন। রুদ্রপ্রয়াগের শোভা তাঁর চিত্ত মথিত করল। চারদিক নিস্তব্ধ। জনহীন শান্তির রাজ্য। মাঝ-মাঝে চকিত ঝরনার কলহাস্য। শ্রীনগর পৌঁছে অলকানন্দা

নদীর তীরে নির্জন কুটিরে আশ্রয় নিলেন সকলে। কিছুদিন সাধন ভজন করে স্বামীজী টিহিরির পথ ধরলেন।

স্বামী অখণ্ডানন্দের অসুস্থতার জন্য ফিরতে হল। দেরাদুনে তাঁর বন্দোবস্ত করে তিন সপ্তাহ পর অখণ্ডানন্দকে এলাহাবাদে তার বন্ধুর বাড়িতে যেতে বলে হৃষীকেশের পথ ধরলেন। কঠোর সাধন পথে যত তিনি এগোতে চান তত বাধা। হৃষীকেশে আবার অসুখে পড়লেন। সুস্থ হবার পরও কিছুদিন কাটল। তারপর মীরাটে এলেন। তখন তাঁর চেহারা ছায়া মাত্র। তিন মাস এখানে থাকলেন। এখানে লাইব্রেরী থেকে বই আনিয়ে পড়তেন তিনি। স্যার জন লবকের গ্রন্থাবলীর এক এক খণ্ড রোজ পড়তেন। স্থানীয় লাইব্রেরীয়ান ভেবেছিল, এ পড়ার ভান মাত্র। কিন্তু প্রশ্ন করতেই সন্দেহ দূর হয়ে গেল। বিস্মিত হয়ে গেল লাইব্রেরীয়ান।

মীরাট ত্যাগ করে হরিদ্বার হৃষীকেশের পথে পথে স্বাধীন সাধুর মতো ঘুরতে লাগলেন। এখানে থাকাকালীন গুরু ভাইদের ডেকে একদিন বললেন, 'আমি নির্জনে একা তপস্যা করতে চাই। আমাকে তোমরা ত্যাগ কর। মায়ার পাকে পড়তে চাই না।' ১৮৯১ সালের জানুয়ারী মাসে এই কথা মতো সবাইকে রেখে একা তিনি দিল্লি চলে গেলেন।

এ সময় হরিদ্বার হৃষীকেশের পথে পথে বহু মহাপুরুষের সাক্ষাৎ তিনি পেয়েছিলেন, পরবর্তী কালে বলেন।

দিল্লিতে একা একা প্রফুল্ল অন্তরে দিন কাটাচ্ছেন। কিন্তু গুরু ভাইরা তাঁকে ছেড়ে থাকতে পারল না। সকলে এসে সমবেত হল। এক সঙ্গে কিছুদিন কাটল। তারপর আবার একলা একদিন বেরিয়ে পড়লেন। মধ্যে অভেদানন্দ ও ত্রিগুণাতীতের সঙ্গে দেখা হয়েছে। স্বামীজীর অজ্ঞাতবাস জীবনের শুরু হল।

রাজপুতানার আলোয়ার রাজ্য। স্থানীয় ডাক্তারের সাহায্যে বাসস্থান পেলেন। এখানে তাঁকে দেখবার জন্য প্রচুর দর্শক সমাগম হতে লাগল। আলাপ ধর্মালোচনায় দিন কাটছিল। তাঁর গৌরকান্তি দিব্যদর্শন প্রত্যেককে অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল। ধনী দারিদ্র বিদ্বান মূর্খ সকলেই তাঁর ভক্ত। প্রত্যেকেরই ধারণা স্বামীজীর কাছে সেই প্রিয়।

আলোয়ার মহারাজের দেওয়ান মেজর রামচন্দ্রজী শুনলেন এই প্রিয় সাধুর আবির্ভাব। স্বামীজীকে সাদরে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন তিনি। মহারাজকে খবর দিলেন। মহারাজের সঙ্গে বিবেকানন্দর আলাপ হল। কথায় কথায় মহারাজ বিদ্রূপ করে বললেন, 'আচ্ছা মহারাজ, সবাই যে মূর্তি পূজা করে আমার তাতে বিশ্বাস নেই, আমি কি করি।'

স্বামীজী কিছু না বলে শুধু বললেন, যার যেমন বিশ্বাস। তারপর সামনের দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবি দেখে সেটা নামিয়ে আনতে বলে বললেন, 'এটা কার ছবি?'

দেওয়ান উত্তর দিলেন, 'মহারাজের।'

এক মুহূর্ত চুপ থেকে বিবেকানন্দ দেওয়ানকে বললেন, 'এই ছবির পর থুতু ফেলুন।' তার কথায় সকলে ভীত সচকিত। কারো

মুখে কথা নেই। তা দেখে স্বামীজী বললেন, 'এ তো মহারাজের ছবি মাত্র—এক খণ্ড কাগজ—এতে এত সঙ্কোচ কেন? মহারাজের শুধু সাদৃশ্য, ছায়া এই ছবি, ভয়ের ভাব দেখে মনে হচ্ছে স্বয়ং মহারাজের গায়ে থুতু পড়বে।'

সকলে হাঁফ ছেড়ে বলল, 'তাই বটে।'

মহারাজকে এবার বললেন স্বামীজী। 'তবে দেখুন—যেহেতু এই একটুকরো কাগজে আপনার প্রতিবিম্ব আছে—তাতে সকলে চিত্রটিকে আপনার মতোই ভাবে—সম্মান দেখায়; ভগবানের ভক্তও সেরূপ মূর্তিতে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষ করে। আমি এইভাবেই দেখি অন্যের কথা বলতে পারি না।'

মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে করযোড়ে বললেন, 'প্রভু আমি এতদিন অন্ধ ছিলাম, বুঝি নি; আজ আমার চোখ খুলল।' মহারাজ মুগ্ধ হলেন স্বামীজীর কথায়, দৃঢ়তায়। তাঁর ওখানে কিছুদিন থাকবার জন্য অনুরোধ করলেন। সম্মত হয়ে কিছুদিন থাকলেন বিবেকানন্দ। বহু লোক এ-সময় তাঁর কাছে যাতায়াত করে। আলোয়ার রাজ্যের যুবকরা বিশেষ করে তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে উঠল। তাদের অন্তরে স্বাধীনতা বোধকে উদ্বুদ্ধ করলেন তিনি। তাঁর অকপট স্নেহ ভালবাসা ঘনিষ্ঠ হয়ে এক সুমধুর সম্পর্ক রচনা করল আলোয়ারবাসীদের হৃদয়ে।

দু'মাস কাটল। শেষ দিন এক শিষ্যের বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে বহু বিষয়ে আলোচনা করলেন। বললেন, 'চরিত্র বজায় রেখে অর্থোপার্জনের শ্রেষ্ঠ উপায় কৃষি। কৃষিকাজের প্রচুর উপকারিতা। গ্রামে বাস করলে এক পরমায়ু বাড়ে। মানুষ নিরোগ স্বাস্থ্য পায়। তাছাড়া ছোট জাতের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপিত হয়—ফলে তাদের মধ্যে শিক্ষা ধর্মভাব বিস্তারের প্রচুর সুবিধে।' ২৮শে মার্চ তিনি আলোয়ার ত্যাগ করেন।

আলোয়ার থেকে পাণ্ডুপোল। এখানে প্রসিদ্ধ হনুমানজীর মন্দিরে রাত কাটিয়ে সকালে টাহালা গ্রামে পৌঁছলেন। মহাদেবের এক প্রাচীন মন্দিরে উঠলেন। একদিন বাদেই নারায়ণী হয়ে বসওয়া থেকে জয়পুর চললেন। জয়পুর যাওয়ার মাঝপথে এক ভক্ত ট্রেনে তাঁর সঙ্গ নিল। সে স্বামীজীর একটি ছবি তুলল। পরিব্রাজকরূপে এই তাঁর প্রথম ছবি। জয়পুরে দু' সপ্তাহ ছিলেন। এখানে বিখ্যাত বৈয়াকরণের কাছে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী পড়বার ইচ্ছে হল। কিন্তু তিনদিনেও বৈয়াকরণ প্রথম ভাষ্যের টীকা স্বামীজীকে বোঝাতে পারলেন না। চতুর্থ দিনে বললেন, 'স্বামীজী বোধ হয় আমার দ্বারা আপনার উপকার হবে না।' ভীষণ লজ্জা পেলেন স্বামীজী। তিনি বুঝবেনই। নির্জনে বারংবার পড়তে লাগলেন। অনবরত পাঠের ফলে তিনদিনের পাঠ তিন ঘণ্টায় আয়ত্ব করে ফেললেন। পণ্ডিতজী তো দেখে স্তম্ভিত।

জয়পুর ছেড়ে আজমীর। আজমীর হয়ে আবু পাহাড় দেখতে গেলেন। এখানে খেতড়ির মহারাজের সঙ্গে পরিচয় হল। পরিচিত হয়ে মহারাজ প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা স্বামীজী জীবনটা কি?'

স্বামীজী বললেন, 'প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে জীবের আত্মপ্রকাশ।' 'শিক্ষা কি' এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন, 'কিছু প্রচলিত সংস্কারকে হৃদয়ে স্থান দেবার নাম শিক্ষা'। মহারাজের কাছে তাঁর রাজ্যে গেলেন বিবেকানন্দ। আর একদিন সত্য কি এ-প্রশ্নে তিনি বলেন, 'মহারাজ পূর্ণ সত্য এক অদ্বিতীয়। সাধারণত যা সত্য বলে মানুষ ভাবে তা আপেক্ষিক। এক সত্য থেকে অন্য সত্যে উত্তরণ হতে হতে চরম সত্যে মানুষ উপনীত হয়। তখন আপেক্ষিক সত্য বিলুপ্ত হয়।' এভাবে আলাপ আলোচনায় বহুদিন কাটল। এখানে রাজসভায় নারায়ণ দাস বৈয়াকরণের কাছে পতঞ্জলি মহাভাষ্য পড়লেন। ক'দিনেই শিখে ফেললেন। মহারাজ আবার একদিন প্রশ্ন করলেন, 'নিয়ম কি?' চিন্তা

না করেই উত্তর দিলেন, 'মন যে ভাবে কিছু জিনিসের অনুমান করে তাই নিয়ম।' খেতড়ি মহারাজ অপুত্রক ছিলেন। মনে শান্তি ছিল না। একদিন স্বামীজীকে তাঁর মনোবাসনা জানিয়ে বললেন, 'আপনি আশীর্বাদ করলে আমার ধারণা আমার বাসনা পূর্ণ হবে।' মহারাজের বেদনা আর আগ্রহে বিবেকানন্দ তাঁকে আশীর্বাদ করেন। এ আশীর্বাদ বিফলে যায় নি।

আবার পথে যাত্রা শুরু হল। আমেদাবাদ, ওয়াডওয়ান থেকে লিমড়ী রাজ্য। ভিক্ষে করে জীবন ধারণ করছিলেন। দিনে ঘুরে বেড়াতেন। রাত্রে যে কোনো স্থানে আশ্রয় নিতেন।

লিমড়ীতে একবার দুর্বৃত্ত সাধুদের হাতে পড়েন। তারা তাঁকে বন্দী করে এনে বলে যে তাদের বিশেষ এক সাধনার সিদ্ধির জন্য একজন প্রকৃত ব্রহ্মচারীর ব্রতভঙ্গ প্রয়োজন। স্বামীজী ভয় পেলেন না। বলে কি, পাগল নাকি? মুখে কিছুই তাদের বললেন না। মনে মনে ভাবতে লাগলেন কি করে এদের হাত থেকে পার পাওয়া যায়। একটি ছোট ছেলে এখানে আসবার পর থেকেই তাঁর কাছে আসত। দুর্বৃত্ত দল পরাদন সকালেও ছেলেটিকে বাধা দিল না। তাকে দেখেই স্বামীজী উপায় স্থির করে ফেললেন। ছেলেটির হাতে কাঠকয়লা দিয়ে খোলামকুচির উপর খবর লিখে ওকে গোপনে তা নিয়ে রাজার কাছে দিতে বললেন। ছেলেটি কথামতো কাজ করল।

মহারাজ স্বয়ং তাঁর দেহরক্ষী পাঠিয়ে স্বামীজীকে উদ্ধার করলেন।

লিমড়ী থেকে জুনাগড় গেলেন এবার। এখান থেকে সামান্য দূরে গীর্ণার পর্বত। সমস্ত ধর্মাবলম্বীর কাছে গীর্ণার আকর্ষণীয়। স্বামীজী ঘুরে ঘুরে দেখলেন সব। ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ধর্মীয় দ্রষ্টব্যের উপাচার। এ-সব দেখে ভুজ রাজ্যে উপস্থিত হলেন। এখানকার দেওয়ানজী মহারাজ উভয়েরই সঙ্গে পরিচয় হল। তাঁর কথায় মহারাজ

খুশি হলেন। কিছুদিন কাটিয়ে আবার জুনাগড়ে ফিরে গেলেন। জুনাগড়ে সামান্য বিশ্রামান্তে প্রভাসের দিকে যাত্রা শুরু হল। সোমনাথের মন্দির, সূর্যমন্দির দেখলেন। পোরবন্দরে এসে আট ন'মাস কাটিয়েছিলেন। এখানকার মহারাজার সঙ্গে পরিচয় হলে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন তিনি। ত্রিগুণাতীতের সঙ্গে এখানে সাক্ষাৎ হয়। ত্রিগুণাতীত অন্য ক'জন সাধুর সঙ্গে হিংলাজ যাবেন বলে কিছু অর্থ সাহায্যের জন্য এখানে এসেছিলেন। তাই শুনে বিবেকানন্দ বললেন, 'ছিঃ অর্থ চাইবে কি জন্য? কেউ ইচ্ছে করে দেয় ভাল, নয় তো পরের জন্য হাত পাতবে।' পোরবন্দর থেকে যাবার সময় ত্রিগুণাতীতনন্দকে বলে দিলেন, তাঁর খবর যেন মঠে না দেওয়া হয়। রাজসভায় থাকাকালীন শঙ্কর পাণ্ডুরাং নামে এক পণ্ডিতকে বেদের অনুবাদ করতে সাহায্য করেন। তাঁর জ্ঞান ধৈর্য দেখে স্থানীয় পণ্ডিতেরা বলল, 'স্বামীজী ভারতবর্ষ আপনার স্থান নয়—আপনি প্রতীচ্যে গিয়ে এই জ্ঞানের বহ্নি জ্বেলে দিন।'

তিনি যত বেদ পাঠ করতে লাগলেন, ততই তাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হল, আধ্যাত্মিকতার মূল উৎস ভারতবর্ষ। অথচ এই গৌরব অন্ধকারে প্রোথিত; কোটি কোটি ভারতবাসী তা হৃদয়ে অনুধাবন করে না—এ ভেবে তিনি অন্তরে দুঃখ পেলেন। বিদেশী শিক্ষায় আত্মবিমুখ এই ধ্বংসের বিরুদ্ধে আমি কি করতে পারি—আমার দ্বারা কি হওয়া সম্ভব? শুধু বার বার এই কথাই ভাবতে লাগলেন।

দ্বারকায় এসে আবার পরিব্রাজকের স্বাধীনতা পেলেন। এখানে সারদা মঠে এক নির্জন প্রকোষ্ঠে বসে তিনি অতীতের কথা ভাবতেন। বর্তমান তমসাচ্ছন্ন কোণঠাসা মাতৃভূমির কথা মনে পড়লেই কি করে তা দূরীভূত হবে ভাবতেন।

খাণ্ডোয়ায় বহু বাঙালী স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ করে তাঁর বিদ্যাবত্তায় বিস্মিত হল। এখানে হরিদাসবাবু অনুরোধ করেন সাধারণের সামনে একটি বক্তৃতা দিতে। কিন্তু তেমন শ্রোতা না পাওয়ায় বক্তৃতা হল না। খাণ্ডোয়ায় থাকাকালীন প্রথম তাঁর মনে সিকাগো ধর্মসভায় যাওয়ার কথা মনে হয়।

১৮৯২ সালে জুলাই মাসে বিবেকানন্দ বোম্বাই শহরে পৌঁছলেন। এই সময় তিনি সদা চিন্তাক্লিষ্ট। তাঁর তখনকার অবস্থা দেখে অভেদানন্দ বলেছেন, 'তখন তাঁকে দেখলেই একটা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত বলে মনে হত।' বোম্বাই থেকে পুণায় গেলেন। গাড়িতে বাল গঙ্গাধর তিলক আর ক'জন ভদ্রলোক। স্বামীজীকে দেখে তাঁরা ইংরেজীতে বলাবলি করতে লাগলেন। 'সাধুরাই ভারতবর্ষের সর্বনাশ করছে।' তিলক সাধুদের পক্ষে কথা বলছিলেন। স্বামীজী প্রথমে শুনছিলেন চুপ করে। অবশেষে আলোচনায় যোগ দিলেন। তাঁর প্রতিভায় সকলে মোহিত হয়ে গেলেন। তিলক তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। পুণা থেকে বেলগাঁওয়ে বহু ব্যক্তির সঙ্গে বহু আলোচনায় যোগ দিয়েছেন। প্রত্যেকের প্রশ্নকে অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নের সঙ্গে উত্তর দিয়েছেন। এখানে প্রায় স্থানেই তিনি তাঁর কথার বিজ্ঞানসম্মত যথাযথ ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। ধর্ম ছাড়া, জড় বিজ্ঞান, রামায়ণ, জ্যোতিষ, ভূতত্ব ও উচ্চাঙ্গ গণিতে অদ্ভুত পারদর্শিতা দেখে সকলে অবাক হয়েছে। বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম উল্লেখ করে পরম যুক্তি দিয়ে সকলকে সরলভাবে ধর্মীয় সত্য বুঝিয়ে দিতেন।

বেলগাঁও ছেড়ে এবার বিবেকানন্দ দাক্ষিণাত্যের তীর্থপথে রওনা হ'লেন। পথে প্রথমেই মহীশূরের বাঙ্গালোরে এসে পৌঁছলেন। এখানকার দেওয়ান কে. সি. আয়ার তাঁর সঙ্গে পরিচয় করেই বুঝতে পারলেন এই সন্ন্যাসী অসাধারণ মনস্বী। এদেশের ইতিহাসে এঁর

নাম উল্লেখ থাকবে। স্বামীজীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। মহীশূর রাজার সঙ্গে দেখা হল। সামান্য সময় বিবেকানন্দ রাজার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করলেন। তিনি রাজপ্রাসাদের কয়েকটি ঘর তাঁর ব্যবহারের জন্য দিলেন। রোজই আলোচনা করতেন ধর্মবিষয়ে। পরামর্শ নিতেন নানা ব্যাপারে। তাঁর স্পষ্টবাদিতায় মহীশূর রাজ্যের সকলেই অবাক হয়েছে। তঁার স্বভাব ছিল এ-রকম। কোনো দুর্বলতা তিনি সহ্য করতেন না। তা বলে অন্যের সামনে কখনো কারো গুণ ছাড়া দোষের কথা বলতেন না।

এখানে এক বিরাট পণ্ডিতসভার ব্যবস্থা হল। বিভিন্ন মতবাদের পক্ষে অনেকে অনেক কথা বললেন। স্বামীজীকে বলতে অনুরোধ করায় তিনি উঠে নিজের প্রাঞ্জল ভাষায় বেদের সার কথা বুঝিয়ে দিলেন। সকলেই মাথা নিচু করল তাঁর অগাধ বিদ্যাবত্তা আর দর্শনের জ্ঞানের কাছে।

একদিন মহারাজ নিভৃতে তাঁকে ডেকে বললেন, 'স্বামীজী বলুন, আমি আপনার কি কাজ করতে পারি ?'

বিবেকানন্দ নিজের জীবনের উদ্দেশ্য তাঁকে বললেন। ভারতবর্ষের একমাত্র সম্বল তাঁর দর্শন ও অধ্যাত্মবিদ্যা। পাশ্চাত্যে আমি তাই প্রচার করব।

মহারাজ তাঁর বিদেশ যাবার সমস্ত অর্থ দিতে চাইলেন।

স্বামীজী কিন্তু তখন সেই অর্থ গ্রহণ করলেন না। বিদায় নেবার জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন। মহারাজ তাকে নানাবিধ উপহার দিতে চাইলেন। সবিনয়ে তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন সে-সব। কিন্তু বারংবার অনুরুদ্ধ হয়ে একটি কারুকার্যখচিত হুঁকা নিলেন।

প্রথমে কোচিন পরে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে গেলেন। এখানকার সৌন্দর্য দেখে তাঁর খুব ভাল লাগল। এখানেও ধর্মের সংস্কৃতির আমূল সংস্কার ও

জাতির উদ্ধার সম্পর্কে আলোচনা করেন। ১৮৯২ সালে ২২শে ডিসেম্বর ত্রিবেন্দাম ত্যাগ করে রামেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে মাদুরায় রামনাদের রাজার সঙ্গে দেখা হল। তিনি তাঁর অনুরাগী ভক্ত হয়ে উঠলেন পরে শিষ্যত্বও গ্রহণ করলেন। রামনাদ রাজও তাঁকে সিকাগো যাবার জন্য উৎসাহিত করলেন। প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে চাইলেন। বললেন, যাওয়া স্থির হলে জানাবেন।

রামেশ্বর দেখলেন বিবেকানন্দ। ভারতবর্ষের এক প্রান্তদেশের তীর্থ। বহুদিনের সাধ পুরল। রামেশ্বর দেখা শেষ করে কন্যা-কুমারীকা দেখবার ইচ্ছা হল। কন্যাকুমারীকাই দক্ষিণদিকের শেষ তীর্থ। এখানে দেবী মন্দির দেখা শেষ করে স্বামীজী বহুক্ষণ ভারতের অতীত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়লেন। ভারতের অন্তর্গত শেষ পাথরের টুকরোর পর বসে ভাবলেন, এই যে আমরা এত সন্ন্যাসী সারা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে ধর্মোপদেশ দিচ্ছি, এ-সব পাগলামি। খালি ধর্মে পেট ভরে না—অন্য কিছু ; নিপীড়িত দরিদ্র এই মানুষকে উদ্ধারের জন্য অন্য কোনো উপায়ের কথা তাঁর হৃদয় জুড়ে বাসা বাঁধল।

স্বামী বিবেকানন্দর এই প্রবজ্যাকালে বহু ঘটনা ঘটে। একবার স্বামীজীকে তাড়িঘাট স্টেশনে চৌকিদার প্ল্যাটফর্মের ছায়ায় বসতে না দিয়ে বাইরে অসহ্য রোদের মধ্যে বার করে দিল। গরম বালির উপর বসে পড়েই তিনি ঘামতে লাগলেন। তাঁর বহু সহযাত্রী নিজেরা ছায়ায় বসে নিঃসম্বল এই অবস্থা দর্শনে হাসতে লাগল। ইতিমধ্যে একজন লোক সেখানে এসে তাঁকে দেখে বলল, 'বাবাজী আপনি এখানে কেন? চলুন ভিতরে চলুন। আপনার জন্য কিছু খাবার এনেছি, গ্রহণ করুন।' লোকটি তাঁকে লুচি-মিষ্টান্ন খাইয়ে ঠাণ্ডা জল দিল। তামাক সাজল। স্বামীজীও অবাক হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার কথা কি করে জানলেন? আপনি কে?'

'স্বপ্নে জেনেছি। আমি এক হালুইকর।'

রাজপুতানার পথে স্বামীজীর সঙ্গে ট্রেনে দু'জন সাহেব যাচ্ছিল। তারা অশিক্ষিত সাধু ভেবে তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা করছিল। কিছু দূরে এক স্টেশনে গাড়ি থামলে স্বামীজী স্টেশন মাস্টারের কাছে ইংরেজীতে এক গ্লাস জল চাইলেন। তিনি ইংরেজী জানেন দেখে সাহেব দু'টি লজ্জায় পড়ে তাঁকে বলল, ইংরেজী জেনেও তিনি কেন তাঁদের প্রতিবাদ করেন নি? উত্তরে তিনি বললেন, 'কারণ এর আগেও বহু মূর্খ লোক দেখেছি।' সাহেবরা উত্তেজিত হয়ে মারমুখো হল। কিন্তু তাঁর সুস্বাস্থ্য ও নির্ভয় চেহারা দেখে শেষে ক্ষমা চেয়ে নিল। আর একবার সহযাত্রী এক থিয়োফিস্ট। লোকটি তাঁকে নানাবিধ প্রশ্নে উত্যক্ত করছিল। স্বামীজী তাঁর বোকার মতো প্রশ্নের উত্তরে কাল্পনিক কথা তৈরি করে বলে গেলেন। তার খাবার খেলেন। এতক্ষণে লোকটিকে বুঝছিলেন তিনি। লোকটি অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাসী। তাঁর এই অন্ধ বিশ্বাস ভাঙবার জন্য একটু কড়া হয়েই বললেন, 'তোমরা হচ্ছ পণ্ডিত মূর্খ—এদিকে শিক্ষিত বলে চেঁচাও, ওদিকে গাঁজাখুরি গল্পে বিশ্বাস কর।'

ভদ্রলোক লজ্জা পেল। তখন বিবেকানন্দ তাঁকে প্রকৃত জ্ঞানের বিষয় নানা কথা বললেন। সে বলল, আর কখনোও কাল্পনিক ব্যাপারে বিশ্বাস করবে না।

এক স্টেশনে অপেক্ষা করছেন স্বামীজী। তাঁর নাম শুনে রোজ লোক আসছে; নানা তত্ত্ব কথা আলাপ চলছে। ক্রমাগত তিন দিন। এত কথা হচ্ছে অথচ কেউ জিজ্ঞাসাও করছে না—তিনি খেয়েছেন কিনা। শেষ পর্যন্ত একটি চামার এসে বলল, 'মহারাজ তিনদিন আপনি জলগ্রহণ না করে কথা বলে যাচ্ছেন। অথচ আপনার খাওয়া হয় নাই।' 'তুমি কিছু খেতে দিতে পার?' এ কথার উত্তরে সে বলল,

'আমার হাতের রুটি আপনাকে কি করে দেব—বলেন তো আটা ও অন্য খাবার এনে দি রুটি তৈরি করে নিন।'

'তোমার তৈরি রুটিই আন—তাই খাব।' অথচ সে-সময়ে সন্ন্যাসীর নিয়ম মতো তিনি আগুনও ছোঁন না। তাঁর আচরণ দেখে স্টেশনের ক'জন লোক বললে, 'আপনি মুচির হাতের খাবার খেলেন?'

উত্তরে তিনি বলেন, 'আপনারা অনেকেই তো নানা কথা বলেছেন এ পর্যন্ত—কেউ খোঁজ নিয়েছেন আমি খেয়েছি কি না—অথচ নিজেদের ভদ্র বলে বড়াই করছেন, ও মুচি নীচু জাত। কিন্তু যে মানবিকতা ওর মধ্যে প্রকাশ পেল তাতে ও নীচ কিসে?'

একদিন চলতে চলতে ক্ষুধা তৃষ্ণায় খুব কাতর হয়ে পড়েছেন। প্রায় মূর্চ্ছা যান। হঠাৎ তাঁর মনে হল আত্মার মধ্যে তো জীবের সব শক্তি নিহিত—তবে এমন কাতর হচ্ছি কেন? সঙ্গে সঙ্গে শত ক্ষমতা ফিরে এল। তিনি আবার হাঁটতে লাগলেন।

ভ্রমণকালীন এ-রকম বহু বিপদে বহুবার তিনি পড়েছেন। অভাব-অনটন। কিন্তু তাঁর অটল ধৈর্য অনন্ত বিশ্বাস সর্বদা তাঁকে সহায়তা করেছে। আশ্চর্য ভাবে তিনি বিপন্মুক্ত হয়েছেন। তাঁর কাছে উঁচু নিচু ভেদাভেদ বোধ কখনো বাধা হয় নি। এবং তাই হয়তো প্রতিটি দেশবাসীকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করবার জন্য তিনি ধাবিত হতে পেরেছেন। আর এই ভাবে বহুজন সংস্পর্শে বহুদেশ বিচরণে ভারতবর্ষের প্রকৃত ছবি তাঁর চোখে উদ্ভাসিত হওয়ায় তিমিরভেদী আলোকের জন্য গোপন এক প্রেরণা তাঁর হৃদয়কে উন্মন করে তোলে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ধর্মহীনতাই এই অধোগতির কারণ। তাই ধর্মকে পুনপ্রতিষ্ঠিত করতে উঠে পড়ে লেগে যান। ধর্মের পাশাপাশি তাঁর চিত্তে দেশ সমাজ সাধারণ মানুষের কল্যাণকামনা জেগে উঠেছিল। নির্বিকার কণ্ঠে তিনি তাই ঘোষণা করেছেন, 'প্রত্যেক পাপীর হৃদয়েই সাধুতার বীজ লুকিয়ে আছে।'

১৮৯২ সালের শেষাশেষি কন্যাকুমারীকা থেকে পণ্ডিচেরী এলেন তিনি। পণ্ডিচেরী থেকে মান্দ্রাজ। মান্দ্রাজে হৈ চৈ পড়ে গেল তাঁর আগমনে। দলে দলে লোক আসতে লাগল। এখানকার যুবকরাই প্রথম তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হল। বিদেশ যাত্রার ব্যবস্থাও তাদের সাহায্যে হয়েছিল। স্বামীজী সাহিত্য দর্শন ধর্ম বিষয়ে নানা কথা বলতে লাগলেন। সকল শ্রোতা অভিভূত হয়ে তাঁর বাণী শুনল। একধারে কালিদাস শেকসপীয়ার অন্যদিকে বেদ বেদান্ত ইতিহাস দৌপদী হেলেন নিয়ে তার বাগ্মীতা শতমুখী প্রস্রবণ হয়ে উঠল।

একদিন তাঁর সম্মানার্থে এক সভায় প্রচুর লোক উপস্থিত। সকলে তাঁর প্রতিভায় স্তব্ধ। কয়েক জন একজোট হয়ে তাঁকে অপ্রতিভ করতে চাইল। কিন্তু তাঁর যুক্তির সামনে সকলে নত হলেন। আর একদিন ক'টি কলেজের ছাত্র তাঁর সামনে গেল। অভিলাষ স্বামীজীকে পরীক্ষা করেন। তারা প্রশ্ন করল, 'ঈশ্বরের স্বরূপ কি!'

স্বামীজী এর উত্তর না দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা শক্তি জিনিসটা কি বলতে পার?' সবাই বইয়ে পড়া বুলি আওড়াল। বিবেকানন্দ তাঁর যুক্তি দিয়ে সে-সব খণ্ডন করলেন। সকলে চুপ মেরে গেলে তিনি বললেন, 'সেকি শক্তি কি তা বোঝাতে পারলে না রোজ এই কথাটা ব্যবহার কর অথচ ঈশ্বর কি তা তোমাদের বোঝাতে হবে।' তখন তিনি ভগবান আর শক্তিকে এক আধারে ধরে নিয়ে গভীর ভাবে তাঁর মত বললেন; সকলে তাঁর কাছে নিজেদের শিশুর শামিল ভেবে নির্বাক চলে গেল।

মান্দ্রাজে বহু ভক্ত এল। তিন সপ্তাহের মধ্যে সমগ্র মান্দ্রাজ তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এখানে শিষ্যদের কাছে বিদেশ গমনের ইচ্ছা জানিয়ে বললেন, 'এখন সমস্ত পৃথিবীতে হিন্দুধর্ম প্রচারের সময় এসেছে। হিন্দুধর্মকে তার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে বার করে ছড়িয়ে দিতে হবে। এর

উদারতা মহিমাকে ঘোষণা করা দরকার। তাঁর এই মহতী সংকল্পের কথা শুনে প্রত্যেক ভক্ত সানন্দে চাঁদা তুলতে লাগল। পাঁচশ টাকা সংগ্রহীত হল দেখতে দেখতে। হঠাৎ এমন সময় তাঁর মনে হল, 'আসলে মা কি এই চায় না আমি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিদেশ যাচ্ছি। মনে এই চিন্তা দেখা দিতেই শিষ্যদের ডেকে বললেন, 'দেখ অন্ধকারে ঝাঁপ দেবার পূর্বে আমি মা-র ইচ্ছা জানতে চাই। তিনি চাইলে আপনি অর্থ আসবে। অতএব এই টাকা এখন গরিবদের বিলিয়ে দাও।'

নির্জনে জগজ্জননীর চরণে প্রার্থনা করতে লাগলেন তিনি, কি তাঁর অভিপ্রায়? এমন সময় হায়দ্রাবাদবাসীরা তাঁর কথা শুনে তাঁকে সেখানে যেতে অনুরোধ করল। এই অনুরোধের মধ্যে মা-র আদেশ নিহিত মনে করে তিনি হায়দ্রাবাদ চললেন। ক্রমশ প্রজ্জালত হুতাশনের মতো তাঁর বার্তা দিকে দিকে প্রচারিত হচ্ছিল। দেশবাসীর হৃদয়ে এমনি করে বিবেকানন্দ শতদলের ন্যায় বিকশিত হচ্ছিলেন। এখানের নবাব সাহেব তাঁর প্রতি প্রীত হয়ে বিদেশ যাত্রার জন্য এক হাজার টাকা দিতে চাইলেন। হাসিমুখে তা প্রত্যাখ্যান করে স্বামীজী বললেন, 'এখনো সময় আসে নি সময় এলে আপনাকে জানাব।'

১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯৩ সালের অপরাহ্নে মহবুব কলেজে বিবেকানন্দ তাঁর পাশ্চাত্য গমন বিষয়ে ভাষণ দিলেন। হিন্দু ধর্মের মহত্ব তার শিক্ষা সাধনার পদ্ধতির বিষয় উল্লেখ করে বললেন, দেশের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার বেদের মহিমা প্রচারের জন্যই তাঁকে বিদেশ যেতে হবে। স্থানীয় বহু ধনী অর্থ সাহায্য করবার বাসনা ব্যক্ত করল।

১৭ই ফেব্রুয়ারী বিবেকানন্দ হায়দ্রাবাদ থেকে পুনরায় মান্দ্রাজে ফিরলেন।

আবার আমেরিকা যাওয়ার জন্য অর্থ সংগ্রহ শুরু হল। মধ্যবিত্ত লোকের কাছ থেকেই চাঁদা নেওয়া হয়েছিল। কারণ স্বামীজী বলেন, তিনি আমেরিকা যাচ্ছেন মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর মানুষের জন্যই। আমেরিকা যাবার সংকল্প ক্রমে প্রবল হয়ে মনে জেগেছে, ধর্ম মহাসভায় বক্তৃতা দেবার এই সুযোগ সোজা নয় সব সময় তা পাওয়া যাবে না। তাই শিষ্যদের চাঁদা তোলায় বাধা দিলেন না। তবু নির্জনে মা-র আদেশ পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁর মনে হল, শ্রীশ্রীমা ঠাকুরেরই অংশ। ঠাকুর যাঁকে প্রকৃতি বলে পুজো করেছেন। মাকে চিঠি লিখে দেখলেই তো হয়। চিঠি লিখবার আগেই অবশ্য সমস্ত সংশয়ের নিরসন ঘটল। স্বপ্নে ঠাকুরের আদেশ পেলেন। ঠাকুর সমুদ্র পেরিয়ে আগে আগে যাচ্ছেন। ইঙ্গিতে তাকে অনুসরণ করতে বলছেন। আর কে যেন কানের মধ্যে বলাছল, 'যাও।'

শ্রীমা-র আশীর্বাদ চেয়ে লিখলেন তিনি। মাও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সানন্দে আশীর্বাদ পাঠিয়ে চিঠি দিলেন। সেই চিঠি পেয়ে আনন্দে আত্মহারা স্বামীজী। জগজ্জননীর বরাভয় এখন তার যাত্রার পাথেয়। সমস্ত বিপদ বিজয়ের রক্ষাকবচ। নির্জনে সমুদ্রতীরে একাকী আত্মচিন্তায় মগ্ন হলেন। মা-রও ইচ্ছা আমি যাই।

তাঁর ঘরে বহু শিষ্য ধর্মোপদেশ শোনবার জন্য জমায়েত। তিনি ঘরে ফিরেই বললেন, 'আমি বিদেশ যাত্রার জন্য প্রস্তুত; মা-র আদেশ পেয়ে গেছি। প্রচুর টাকা চাঁদা উঠে গেল। দু'দিনের মধ্যে যাত্রার সমস্ত স্থির, কিন্তু এমন সময় সমস্ত ব্যবস্থা খেতড়ির রাজার জন্যে বদলে গেল। খেতরি রাজ স্বামীজীর আশীর্বাদে পুত্র সন্তান লাভ করেছেন। তিনি একটি উৎসব করছেন। স্বামীজী বাদে সেই উৎসব বৃথা জেনে সেক্রেটারী জগমোহনকে পাঠিয়েছেন তাঁকে নিয়ে যেতে।

সব শুনে স্বামীজী বললেন, 'আমি আমেরিকা যাচ্ছি এখন কি যাওয়া সম্ভব।'

জগমোহন উত্তর দিলেন, 'আপনি না গেলে মহারাজ অত্যন্ত দুঃখিত হবেন অন্তত একদিনের জন্য চলুন।'

বাধ্য হয়ে স্বামীজী সম্মত হলেন। মান্দ্রাজ ছাড়লেন তিনি। ঠিক হল এখানে আর আসবেন না। খেতরি থেকে সোজা বোম্বাইতে জাহাজে উঠবেন।

সন্ধ্যায় স্বামীজী খেতড়িতে পৌঁছলেন। বহু রাজন্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তির মাঝে মহারাজ স্বামীজীর চরণ-বন্দনা করে তাঁকে নির্দিষ্ট আসনে বসালেন। সকলের সঙ্গে পরিচয় হল। সনাতনধর্ম প্রচারের জন্য তিনি পাশ্চাত্যে যাচ্ছেন শুনে সকলেই তাঁকে প্রচুর ধন্যবাদ দিল। স্বামীজীর আশীর্বাদের জন্য শিশুপুত্রকে সভায় আনা হল। তার মস্তকে হাত রেখে তিনি গম্ভীর কণ্ঠে কল্যাণবাণী উচ্চারণ করলেন।

ক'দিন পর স্বামীজী বিদায় নিলেন। মহারাজ তাঁকে বিদায় দেওয়ার জন্য জয়পুর পর্যন্ত এলেন। তাঁর সমুদ্রযাত্রার যাবতীয় জিনিসের বন্দোবস্ত করে দিলেন। আবু রোড স্টেশনে রাত কাটল। এখানে পুনরায় গাড়িতে উঠবার সময়ে এক গণ্ডগোল বাঁধে। স্বামীজীর এক বাঙালী ভক্ত, তাঁর সঙ্গে কথা বলছিল। হঠাৎ এক সাদা চামড়া এসে ভদ্রলোককে নামতে বলল। ভদ্রলোক নামলেন না। দু'জনে ঝগড়া বেঁধে গেল। স্বামীজী ভক্তকে ঝগড়া থেকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করছিলেন। এতে রেলকর্মচারী শ্বেতাঙ্গটি হঠাৎ তাঁকে 'তুম কাহে বাত করতে হো' বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বিবেকানন্দ আরক্ত চক্ষু তুলে তাকালেন তার প্রতি। তীব্র স্বরে বললেন, 'তুম তুম কাকে বলছ, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলছ ভদ্রতা জান না। আপ বলতে পার না।' লোকটা বুঝল ভুল হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি

থতমত খেয়ে বলল, 'অন্যায় হয়েছে আমি হিন্দী ভাল জানি না। আমি শুধু এই লোকটাকে…'

বিবেকানন্দ ফেটে পড়লেন। বললেন, 'তুমি বললে দেশী ভাষা জান না, এখন দেখছি নিজের ভাষাটাও জান না। লোকটা কি? ভদ্রলোক বলতে পার না—তোমার নাম নম্বর বল, তোমার ব্যবহার উপরে জানাব।'

বেগতিক দেখে সাহেব কেটে পড়তে চায়। স্বামীজী ছাড়বার লোক নয়। 'শেষবার বলছি নম্বর দাও, নয়তো লোকে দেখুক তোমার মতো কাপুরুষ পৃথিবীতে নেই।' এই কথা শুনে সাহেব ঘাড় নামিয়ে চলে গেল।

বোম্বাইতে নানা জিনিসপত্র সহ জগমোহন স্বামীজীর সঙ্গে বহু অর্থ দিয়ে তাকে পি. অ্যাণ্ড. এ. কোম্পানীর পেনিনসুলার জাহাজের একখানা টিকিট কেটে দিল।

১৮৯৩ সালের ৩১শে মে জাহাজ ছাড়বার তারিখ। গৈরিক রেশমী পোশাকে ভূষিত বিবেকানন্দ রাজার ন্যায় জাহাজে উঠলেন। মন নানা চিন্তায় আচ্ছন্ন। ঢং ঢং করে জাহাজ ছাড়বার ঘণ্টা বাজল। সকলের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। স্বামীজী যতক্ষণ তীর দেখা যায় ডেকে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর স্মৃতিতে শ্রীশ্রীমা, বরাহনগরের মঠ, গুরুভাই দেশ ধর্ম সভ্যতা মাতৃভূমি ত্যাগের বেদনা প্রভৃতি একত্রে উদিত হয়ে নয়ন অশ্রুসিক্ত করে তুলল।

আমেরিকা যাত্রার ঠিক প্রাক্কালে তিনি বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করেন। এর আগে লোকের হাত এড়ানোর জন্য বহু নাম গ্রহণ ও ত্যাগ করেন।

দু'চার দিনের মধ্যেই স্বামীজী জাহাজে আলাপ জমিয়ে নিলেন। এক সপ্তাহ বাদে জাহাজ কলম্বো পৌঁছল। বিবেকানন্দ কলম্বোয়

নেমে বুদ্ধদেবের নির্বাণপ্রাপ্ত সময়ের আধশোয়া একটি মূর্তি দেখলেন। তাঁর ভাল লাগল। কলম্বো হয়ে মালয়ের রাজধানী পেনাং শহরে জাহাজ থামল। পেনাং-এর পরে সিঙাপুর তারপর হংকং। হংকং থেকে চীন মুলুকের শুরু। চীন আর ভারতবর্ষ সমান দরিদ্র। সভ্যতার ঘরে দুটিই পশ্চাৎবর্তী দেশ। হংকং-এ তিন দিন জাহাজ ছিল। এখান থেকে স্বামীজী ক্যান্টন দেখতে যান। অনেকগুলো মন্দির ঘুরলেন তিনি। সবচেয়ে বড় মন্দিরের মধ্যে ধ্যানলিপ্ত বুদ্ধমূর্তি তাঁকে আকর্ষণ করল। এখানে একটি মঠ দেখবার সাধ হল। অথচ বিদেশীদের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। এ-কথা শুনে স্বামীজীর মনোবাসনা প্রবল হল। সঙ্গীদের ধরে বললেন, গিয়েই দেখা যাক কি হয়। এই বলে একটি মঠাভিমুখী সকলে চলতে লাগলেন। সঙ্গে দোভাষী। সঙ্গী ক'জন জার্মান। সামান্য এগোতেই দোভাষী বলল, 'শিগ্‌গির পালান, ঐ দেখুন।' সামনে ক'জন লোককে লাঠি নিয়ে আসতে দেখা গেল। তাই দেখে সকলে চো-চা দৌড়। দোভাষীও পালাচ্ছিল। স্বামীজী তার জামা ধরে বললেন, 'আমায় আগে যোগী কথার প্রতি শব্দ বলে যাও।' কোনো রকমে বলে দোভাষী ছুটল। লোকগুলো ঘাড়ের পর এসে পড়েছিল। বিবেকানন্দ স্থির দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি একজন যোগী।' সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের মতো কাজ হল। লাঠি ফেলে তারা লজ্জায় তাঁর পায়ে পড়ল। তারা তাঁকে মঠবাড়িতে নিয়ে গেল।

এরপর জাপান গেলেন। জাপানীদের পরিচ্ছন্নতা তাঁর কাছে খুব ভাল লাগল। জাপানের নাগাসাকি, কিয়েটো, টোকিও দেখলেন। জাপান থেকে মান্দ্রাজে এক চিঠি লেখেন তিনি। তাতে জাপানীদের ক্রমোন্নতির নিদর্শন তুলে ধরে দেশের যুবকদের উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করলেন। ভুয়ো শিক্ষার মোহে ভ্রান্ত স্বদেশবাসীদের ভর্ৎসনা জানালেন। ধিক্কার দিয়ে বললেন, এখানে এসে দেখে নিজেরা শেখ।

ভারতমাতা কমপক্ষে হাজার যুবকের বলি চান। যারা মানুষ, পশু নয়। সেই ভাবে সকলে এগিয়ে এসে প্রস্তুত হও।

জাপান থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে কানাডার দক্ষিণ পশ্চিমের একটি দ্বীপে এলেন। সমুদ্রে প্রচণ্ড শীত পড়েছিল শীতে কষ্ট পেলেন।

কানাডার মধ্যে দিয়ে ট্রেনে করে সিকাগোয় পৌঁছলেন। বিখ্যাত রকি পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে ট্রেন চলছিল। চারপাশে নয়নলোভন দৃশ্যে মোহিত হলেন তিনি। সিকাগোয় পৃথিবীব্যাপী মেলা বসেছে। প্রচুর জন সমাগম হয়েছে। প্রথমে কিছুটা হতচকিত হয়ে পড়লেন তিনি। তাঁর অদ্ভুত বেশবাস দেখে পেছনে লোক লাগল। ঠাট্টা বিদ্রূপ চলতে লাগল। কোনো রকমে গা বাঁচিয়ে একটি হোটেলে উঠলেন তিনি। এখানে বারো দিন ছিলেন। ঘুরে ঘুরে মেলা দেখলেন। চারপাশে এত মানুষের ভিড়েও নিজেকে খুব নির্জন লাগছিল। জলের মতো পয়সা খরচ হচ্ছে। চিন্তায় পড়লেন তিনি। ধর্মমহাসভা সেপ্টেম্বর মাসে। এখন জুলাই—এতদিন থাকা প্রায় অসম্ভব। তারপর ধর্মসভার প্রতিনিধি নির্বাচিত হবার দিনও শেষ হয়েছে। একবার ভাবলেন, ফিরে যাই। পরে স্থির করলেন—শেষ পর্যন্ত দেখি না কি হয়। লোকমুখে শুনলেন বোস্টনে থাকার খরচ অনেক কম—সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করলেন, কিছু দিন সেখানেই কাটানো যাক।

ট্রেনে বোস্টন যাবার সময় ব্রিজি মেডোস নামক গ্রামের বর্ষীয়াণ এক মহিলার সঙ্গে পরিচয় হল। তিনি তাঁকে তাঁর বাড়িতে সাদরে আহ্বান করলেন। খাওয়া খরচা কিছুটা সাশ্রয় হল। কিন্তু কাপড় জামার দরকার। সামনে শীত। তাছাড়া এই অদ্ভুত পোশাকে সকলেই তাঁকে উপহাস করছে। ব্রিজি মেডোস থেকে আর্থিক অনটনের কথা জানিয়ে মাদ্রাজে চিঠি দিলেন।

পয়সার অভাবে চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেও ধৈর্য বা মনোবল হারান নি। স্থানীয় লোকের মধ্যে ক্রমাগত পরিচিত হয়ে আপন সিদ্ধির পথ করে নিচ্ছিলেন। এ-সময়ে গ্রীক ভাষায় সুপণ্ডিত জে. এইচ. রাইটের সঙ্গে আলাপ হল। তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁকে ধর্মমহাসভায় যোগদানের কথা বললেন। বিবেকানন্দ তাঁর অসুবিধার কথা জানালেন। প্রথমত তাঁর কাছে তিনি যে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি তাঁর কোনো অভিজ্ঞান নেই। সব শুনে রাইট নিজে সমস্ত ভার নিলেন। স্বামীজীর বিষয় তিনি ধর্মসভার ব্যবস্থাকারাদের কাছে লিখলেন। তাঁর পরিচয় সম্পর্কে বললেন, 'আমাদের বিজ্ঞ পণ্ডিতদের সকলের বিদ্যা এক করলেও এঁর সমান হবে না।'

এতেও স্বামীজীর দুর্ভোগ শেষ হল না। ব্যবস্থাদির পর ট্রেনে চললেন। পথে ঠিকানা হারিয়ে গেল। সন্ধ্যেয় সিকাগোয় নেমে অকূলে পড়লেন। কোনো লোকেই তাঁর সাহায্য করল না। শেষ পর্যন্ত, নিরাশ হয়ে স্টেশনের এক কোণে একটি বাক্সের মধ্যে শুয়ে পড়লেন। রাত শেষ হলে হ্রদের উপকূল ধরে হাঁটতে শুরু করলেন। খিদেয় কাতর হয়ে ভিক্ষে করতে লাগলেন। তাঁর মলিন বসন শ্রান্ত চেহারা দেখে সকলেই তাঁকে তাড়িয়ে দিল। কেউ তাঁর কথায় কান দিল না। শেষ পর্যন্ত অবসন্ন হয়ে রাস্তার ধারে বসে পড়লেন তিনি। এমন সময় বিরাট বাড়ির একটি মহিলা তাঁর সামনে এসে বলল, 'আপনি কি ধর্ম মহাসভার প্রতিনিধি?' স্বামীজী বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিকানা হারিয়ে এই হাল।'

মহিলাটি তাঁর যত্ন করল ভৃত্যদের দ্বারা তাঁর পরিচর্যা করাল। ভদ্রমহিলার নাম মিসেস হেল। তিনি স্বামীজীকে ধর্ম মহাসভায় অফিসে পৌঁছে অন্যান্য প্রাচ্যের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে থাকবার ব্যবস্থাদি করে দিলেন। সিকাগো ধর্মসভা সম্পর্কে বিবেকানন্দ এক

জায়গায় লেখেন, সিকাগো ধর্ম মহাসভা এক বিরাট ব্যাপার। বহু দেশের ধর্ম প্রচারকদের প্রতিনিধি হিসেবে সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভার আয়োজনের যে উদ্দেশ্যই থাকুক—পরিণাম খুব ফলপ্রসূ হয়েছিল। পাশ্চাত্যের ধর্মের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের তুলনা করার একটি বিশেষ সুযোগ এই সূত্রে পাওয়া যায়। এবং সভান্তে, মানুষের দৃষ্টি ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্রতার বহু উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয়। যা মানবজাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণের পথই নির্দেশ করে।
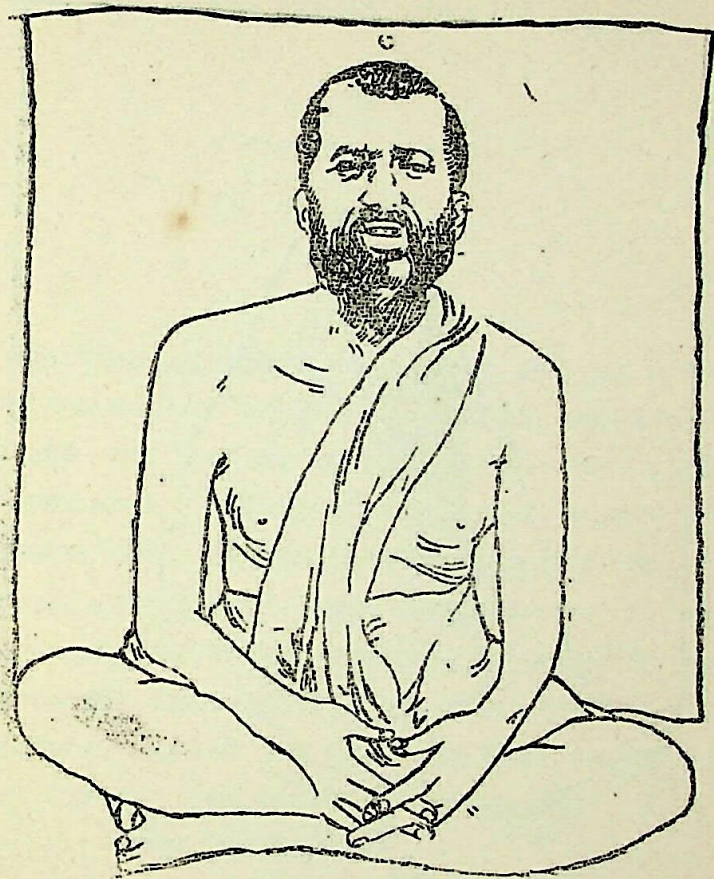
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব
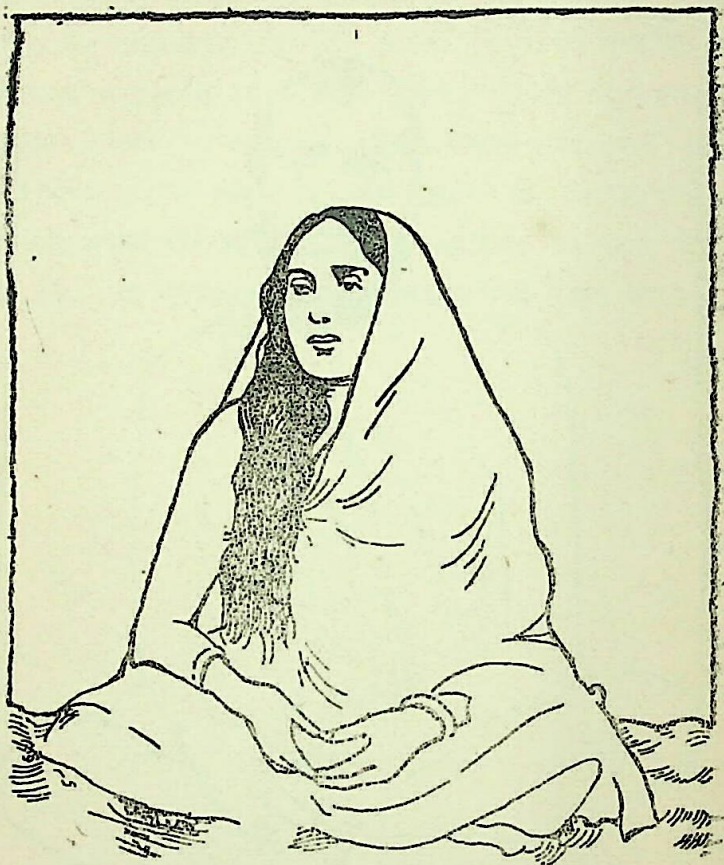
শ্রীশ্রী মা সারদামণি

১৮৯৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবার দশটায় প্রথম ধর্ম মহাসভার অধিবেশন শুরু হয়। আর্ট ইনস্টিটিউটের হল অব কলম্বাসে ডাক্তার ব্যারোজ সভার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে উদ্বোধন করলেন। পাঁচ ছ হাজার মহা-মহা পণ্ডিত। একটি গম্ভীর পরিবেশ, পণ্ডিতদের মধ্যে রোমান পোপ কার্ডিনাল গিবন্স। এক পাশে বিবেকানন্দ রয়েছেন, তাঁর পাশে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতাপ মজুমদার। বক্তৃতা করবার তালিকায় স্বামীজীর সংখ্যা ত্রিশ। প্রথমে সভা সম্পর্কে যা ভেবেছিলেন তিনি—সভায় উপস্থিত হয়ে দেখলেন তাঁর কল্পনার চেয়েও এই সভা ব্যাপক—তাঁর বক্তৃতার সময় উপস্থিত হলে তাই তিনি 'এখন নয়' বলে সময় নিলেন। ক'বারই তাঁকে সময় নিতে হল। শেষে যখন বলা হল, এখন না বললে আর সুযোগ পাবেন না—অগত্যা তাঁকে উঠতে হল।

তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম—সম্মুখে গম্ভীর গভীর জনমণ্ডলী।

একটি উদাত্ত কণ্ঠ হঠাৎ নিশব্দ হলঘরের মধ্যে প্রত্যেকটি উপস্থিত ব্যক্তিকে আপন করে ফেলল মুহূর্তে। সমবেত আমেরিকাবাসী ভাই ও বোনেরা—সঙ্গে সঙ্গে একটি করতালি ধ্বনি চারপাশ থেকে উত্থিত হয়ে বিবেকানন্দর কণ্ঠকে ঢেকে দিল। প্রথমে তিনি হতচকিত—পরে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনের উত্তরে জ্বলন্ত আগুনের মতো তিনি বিকশিত হলেন। প্রথম দিনের ভাষণ সংক্ষিপ্ত। প্রাথমিক কথা, সকল

ধর্মের লক্ষ্য এক। সাম্প্রদায়িকতা শূন্য এই একটি বাক্যেই বিবেকানন্দ বিশ্ব জয় করে ফেললেন।

প্রথম দিনের বক্তৃতার পর 'আমাদের মতভেদ কেন' নামে ছোট ভাষণ দিলেন। সহজ সরল ভাষায় যুক্তি দিয়ে পাশ্চাত্য ভ্রান্ত ধারণার নির্দেশ করে গেলেন, প্রতিপাদ্য হিন্দুধর্মের বহুর মধ্যে একের প্রকাশের ব্যাখ্যা করলেন। কোনো ধর্মকে কোনো জাতিকে আঘাত না করে শুধু চিরন্তন সত্যের মধ্যে কার কথা বললেন। সকলের জ্ঞানকে লম্বিত রেখায় উর্ধ্বগামী করে তুললেন।

তাঁর বক্তব্য বাচনভঙ্গী আন্তরিকতা সম্পর্কে ইংরেজ জীবনীকার এক জায়গায় লিখেছে; খ্রীস্টের পর এমন আশার বাণী প্রচারে আর কেউ সক্ষম হয় নি।

১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর 'হিন্দুধর্ম' এবং 'ধর্মই ভারতের প্রকৃত অভাব নয়' এই দুই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ফলে ধর্মপ্রচারকের, দার্শনিক খোলসের ভেতর থেকে তাঁর স্বদেশ প্রাতি আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ২২ তারিখ সভার বিজ্ঞান শাখায় আরো দুবার তিনি নৈষ্ঠিক হিন্দুধর্ম ও বেদান্তদর্শন ও ভারতের 'আধুনিক ধর্ম' বিষয়ের কথা বললেন। ২৪ তারিখে হিন্দুধর্মের সারতত্বর উপর আর একটি বক্তৃতা দেন। এ-ছাড়া ২৬ তারিখে মূল সভায় 'বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের ক্রমপরিণতি' বিষয়ে বললেন।

বোস্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট মহাসভা সম্পর্কে লেখে, ধর্মসভার পরিচালকগণ শেষ পর্যন্ত, লোককে আকর্ষণ করার জন্য স্বামীজীকে শেষদিকে রাখতেন। সকলে তাঁর কথা শুনবার জন্য অন্যান্য নীরস ধর্ম তত্ব শুনেও বসে থাকত।

সিকাগো ধর্ম মহাসভার মধ্যে দিয়ে বিবেকানন্দ হঠাৎ দিবাকরের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলেন। তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল। সিকাগো

শহর তার ছবিতে মুখরিত হয়ে উঠল। তাঁকে একবার দেখবার জন্য মুখের একটা কথা শোনবার জন্য লোকে পাগল হয়ে উঠল। এ সম্পর্কে তিনি নিজে লিখেছেন, আমেরিকানদের দয়ার কথা কি বলব! খুব সুখে আছি। আমার ইউরোপ যাবার খরচ এখানেই সংগ্রহ হয়ে যাবে।

ইচ্ছে করলেই তিনি রাজভোগে পরবর্তী দিন আমেরিকায় কাটাতে পারতেন। কিন্তু এমন বিপুল খ্যাতির মধ্যেও একদিনও স্বদেশের কথা ভোলেন নি। মাতৃভূমির দারিদ্র্য যন্ত্রণায় তিনি ছটফঠ করতেন।

তাঁর এই জনপ্রীতিতে তদানীন্তন খ্রীস্টান পাদরীরা কিছুকাল তাঁর শত্রুতা করেছিল। তারা এমন কি সুন্দরী মেয়েছেলে পাঠিয়ে তাঁকে প্রলোভিত করতে চেয়েছে। ভারতবর্ষীয় মিশনারী প্রচারকরাও বিদেশে থাকাকলীন তাঁর সম্পর্কে প্রচুর কুৎসা রটনা করে। কিন্তু অম্লান এই চরিত্রের স্পর্শে সকল অপপ্রচার বুদ্বুদ মাত্র। তিনি এসব কথায় ভ্রুক্ষেপও করতেন না। একটি বক্তৃতা কোম্পানীর আহ্বান পেয়ে তিনি ঘুরে ঘুরে ধর্ম, দেশ, জাতি, ভারতীয় নারী প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ে আমেরিকাবাসীদের শোনালেন। বোস্টন, ব্রুকলিন, ওয়াশিংটন, নিউ-ইয়র্ক ঘুরলেন।

মাঝে মাঝে এই প্রচার তাঁকে ব্যথিত করে তুলত। বিরক্তি ধরত মনে। তা সত্বেও অবশেষে ধৈর্য ধরে তিনি কাজ করে চললেন। শেষ পর্যন্ত কোম্পানীর হীন মনোবৃত্তিতে বাধ্য হয়ে তাদের সম্পর্ক ছাড়লেন। এই ভ্রমণ কালে তিনি বহু বিশ্ববিদ্যালয়, চিত্রশালা, যাদুঘর, সমস্ত দেখতেন, উন্নত আমেরিকানদের সর্বাঙ্গীন বিষয়ে আলোচনা করতেন।

আমেরিকানদের সত্যানুরাগ, স্বাধীন নারীত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করলেন তিনি। বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাঁর। মিস্টার ইঙ্গারসোল তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

মিস্টার ইঙ্গারসোল ছিলেন নাস্তিক। ধর্ম বা ঈশ্বর মানতেন না। কথা প্রসঙ্গে তিনি একবার বলেন, 'জগৎকে যথা সম্ভব ভোগ করার পক্ষপাতি আমি ; লেবু কচলে যতটা পারা যায় রস বার করে নিতে হবে ; কারণ পৃথিবীর অস্তিত্বই আমাদের কাছে একমাত্র নিশ্চিত—আর সব অনিশ্চিত।'

'আপনার চেয়ে ঢের ভাল উপায়ে লেবু নিংড়াতে আমি জানি —' উত্তরে বলেন বিবেকানন্দ; 'তাতে আরো বেশি রস পাওয়া যায়; আমি জানি আমার মৃত্যু নেই তাই রসগ্রহণের ব্যস্ততাও কম। আমি জানি ভয়ের কোনো কারণ নেই—সুতরাং মজিয়ে মজিয়ে সুখ আহরণ করি। সকলেই আমরা কাছে ঈশ্বরের বিকাশ, ঈশ্বর-বোধে মানুষকে ভালবাসায় কত গভীর সুখ, এই ভাবে লেবুর রস বার করে ফেলুন— দেখবেন এক ফোঁটাও বাদ যাবে না।'

একবার এক গ্রামে বক্তৃতার সময় বিপদের মুখে পড়েন তিনি। গ্রামের কিছু যুবক, তিনি সকল অবস্থায় অবিচলিত এই কথা শুনে তাঁকে পরীক্ষা করে। একটা পিপের উপর উঠে তিনি ভারতীয় দর্শন বোঝাচ্ছেন, এমন সময় তাঁর কানের পাশ দিয়ে সো সো করে গুলি ছুটতে লাগল। বক্তৃতার তন্ময়তায় সেদিকে মন না দিয়ে এক নাগাড়ে বলে চললেন। তাঁর এই অবিচল দৃপ্ততা সকলকে মুগ্ধ করল। তারা বুঝল বিবেকানন্দ সম্পর্কে যা লোকে বলে তা খাঁটি।

একটি রেল স্টেশনে নেমেছেন স্বামীজী। অনেক নিগ্রো এসে ঘিরে ধরল। একজন বলল, 'আপনি আমাদের স্বজাতি, আপনার নাম শুনে করমর্দনের জন্যে এসেছি।' নিজের নিগ্রো পরিচয়ে কিছুমাত্র বিরক্ত না হয়ে ভাই বলে তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন।

আমেরিকার জনসাধারণ বস্তুত একঘেয়ে বাঁধা ধর্মের বুলি শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তারা তাঁর অন্যবিধ আলোচনায় নতুন কিছু

শুনে উদ্যম ফিরে এল। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ বিশ্বাস তাদের চোখে নতুন রঙ মাখাল। তাঁর চেহারা চরিত্র ধৈর্য মানবিকতা প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞান সকলকে অভিভূত করে ফেলেছিল অনায়াসে। আমেরিকার প্রতি কাগজে পাতায় পাতায় দিনের পর দিন বড় বড় হরফে এই একটি নাম ও একটি জীবন যেন এক সুখের বন্যাকে নিঃশব্দে প্রবাহিত করে তুলল।

শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র একালের দিব্য পুরুষ অবলীলায় একা একটি ভূখণ্ড জয় করলেন।

আমেরিকার এই সব খবর ভারতে যথাসময়ে পৌঁছল। মঠে সকলে শুনে আত্মহারা ; 'নরেন জগৎ মাতাবে', এতদিনে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিগণিত হল। ভারতবর্ষের সর্বত্র বিশেষ করে বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে একটি নাম কেউ যেন গেঁথে দিল। তাঁর সঙ্গে ভগবানরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত মূল্য প্রতিটি হৃদয়ের গভীরে ব্যঞ্জনা তুলল।

টাউন হলে বিরাট সভা বসেছে। রাজা প্যারীমোহন সভাপতি। উপস্থিত বহু পণ্ডিতবর্গ। সভা থেকে স্বামীজীর কাছে একটি চিঠি পাঠানো স্থির হল : একটি যত্নোচিত কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য পত্রটির বিষয়বস্তু। সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গেও বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। একটি ত্যাগী পুরুষ যিনি শুধু ধর্মে লিপ্ত না থেকে ধর্মীয় প্রভাব দ্বারা ধর্মকে উদ্দীপিত করেছেন—সেই মহাপুরুষকে প্রণাম। আবহমান কাল থেকে সভ্যতার অনাদি স্রোতে যে সকল মহাপুরুষরা পৃথিবীতে এসেছেন, নিজেদের উপলব্ধি ও অনুভূতিকে আপামর জনতার কাছে ব্যক্ত করেছেন—বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে তাদের অন্যতম।

বস্তুত কলুষিত দেশের অন্তরাত্মার সামনে ঈশ্বরের আবির্ভাবের মতো বিবেকানন্দ শব্দটি প্রলম্বিত হয়ে হিন্দুধর্মের পূর্ব গৌরব হৃত বিশ্বাসকে ফিরিয়ে আনল।

আমেরিকার সিকাগো মহাসভার অধিবেশন সমাপ্ত হলে শুরু হল বিজয় পর্যটন। ব্রাজিল, নিউ ইয়র্ক প্রভৃতি শহর। বক্তৃতার সময়ে কর্মের প্রেরণায় আগুনের বিস্তারের মতো তিনি ছড়িয়ে পড়লেন। তাঁর সেই বহ্নিমান প্রকাশ তদানীন্তন চিঠির মধ্যেও দেখা যায়। নিজের আত্মনির্ভরতাকে প্রবাহিত করতে লাগলেন গুরুভাই ও শিষ্যদের মধ্যে। ধর্মের কথা, ঈশ্বর বিশ্বাস এ সবের উপরে তিনি স্থান দিয়েছেন স্বদেশ-সেবার। তাঁর কাছে জননী জন্মভূমি স্বর্গের চেয়ে বড়, স্বর্গের চেয়ে প্রিয়। যে পুরুষ প্রকৃত প্রেমে আপন মাতৃভূমিকে ভালবাসে—সন্তানের ন্যায় তার অশ্রুমোচনে ব্যগ্র সেই এ জগতে প্রকৃত আদর্শবান—এ কথা বিবেকানন্দ যথার্থ বলে মানতেন। দ্বিধাহীন কণ্ঠে নিজের সম্পর্কে বলেছেন : 'লোকে আমার স্বপক্ষে কি বিপক্ষে যাই বলুক তাতে কান দিও না—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি কাজ করে যাব। এমন কি মৃত্যুর পরও। মিথ্যার চেয়ে সত্যের গুরুত্ব সহস্রগুণ বেশি। চরিত্র পবিত্রতা মনুষ্যত্ব সব কিছুই সত্যকে অবলম্বন করে। সুতরাং সত্য থাকলেই হবে। আমি যত দিন বাঁচব তোমাদের চিন্তা নাই—আমার ক্ষতির চেষ্টা যেই করুক সে বিফল হবে—ঈশ্বরের কথার ন্যায় এ সত্য।'

সত্যর প্রতি নিজের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ছিল বলে এমন চিঠি তিনি লিখেছিলেন।

নিউ ইয়র্কে রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ শিক্ষা দিচ্ছিলেন তিনি। মঠের মতো শিক্ষাগারের পরিবেশ। এখানে তিনি যোগের উপদেশই দিতেন না। নিজে পরীক্ষা দ্বারা বোঝাতেন। যাতে শিক্ষার্থীর মনে সংশয় না থাকে। কারণ তিনি নিজে গুরুকে বাজিয়ে নিয়েছেন সুতরাং অন্যকে বাজানোর সুযোগ দেবেন না কেন! যোগ সম্পর্কে তাঁর পাঠকে শরীরতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের সঙ্গে এমন ভাবে মিলিয়ে দিতেন যে

সকলেই মুগ্ধ হয়ে যেত তাঁর প্রজ্ঞায়। ফলে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতরা তাঁর কথায় আস্থা স্থাপন করেছিলেন।

এই সময়ে জুন মাসে বিবেকানন্দ 'রাজযোগ' গ্রন্থটি প্রথম রচনা করেন। পতঞ্জলি যোগসূত্রের ব্যাখ্যা মিস ওয়ালডো তাঁর মুখ থেকে শুনে সামনে বসে লিখতেন। নিউ ইয়র্কে বহু নামকরা লোক তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করে। এমন অনেক শিষ্য আছে—যারা জীবনে তাঁকে দেখবার সুযোগ পায় নি।

ধর্ম মহাসভায় অধিবেশনের সময় থেকে ১৮৯৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত বিবেকানন্দ। মেন ক্যাম্প নামক একটি নির্জন স্থানে ক দিন থাকবার জন্য এক বন্ধু এ সময় অনুরোধ করল। সানন্দে রাজী হলেন তিনি। সেন্ট লরেন্স নদীর মধ্যে ছোট্ট একটি দ্বীপে দেড় মাস কাটালেন। এখানে একদিন নির্বিকল্প সমাধি হয়। যেই অনুভূতিকে নিজে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুভূতি বলে ভাবতেন। সংগ অব দি সন্ন্যাসীন কবিতাটিও এখানে রচনা করেন।

দেড়মাস বাদে নিউ ইয়র্ক ফিরে ইংলণ্ড যাওয়ার ব্যবস্থায় মন দিলেন। ইংলণ্ড থেকে দু' একজন বন্ধুও তাঁকে যাওয়ার কথা লিখছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি সংকল্প স্থির করলেন।

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি অন্য এক বন্ধুর সঙ্গে স্বামীজী আমেরিকা ত্যাগ করে প্রথমে প্যারীতে পৌঁছলেন। ইউরোপীও সভ্যতার জননী প্যারী। ঘুরে ঘুরে ইতিহাসের নায়িকা নগরী দেখলেন। সেপ্টেম্বর মাসেই লণ্ডন যাত্রা করলেন।

এই সময় ভারতে বিশেষ করে বাংলা দেশে তাঁর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে মিশনারীরা বিদ্বেষ ছড়াতে থাকে। নানা ছলনার দ্বারা তারা দেশবাসীর মনে মিথ্যাকে প্রোথিত করতে চায়। প্যারিতে এ-সব বিষয় জানতে পেরে অবিচল হৃদয়ে স্বামীজী শিষ্যদের নির্ভয় হতে চিঠি লেখেন।

বিব্রত শিষ্যরা তাঁর অভয়ে আপন সিদ্ধি ও নিষ্ঠার পথে সুদৃঢ় হয়ে নিশ্চিন্ত হয়।

লণ্ডনে পৌঁছেই প্রচুর সম্বর্দ্ধনা পেলেন তিনি। বিজিত জাতির প্রতিনিধি হিসেবে যে বিষয়ে কিছু সন্দেহ ছিল। সেখানে তিন সপ্তাহের মধ্যে কঠোর পরিশ্রমে আবার মেতে উঠলেন। শুরু হল পুনরায় বক্তৃতার পর বক্তৃতা। সেই এক বিষয়, বেদান্ত ও আধ্যাত্মিকতা।

স্ট্যাণ্ডার্ড কাগজ তাঁর বক্তৃতা সম্পর্কে লিখল : ইংলণ্ডের মানুষ রাজা রামমোহন রায় এবং কেশবচন্দ্র সেন ছাড়া অন্য কোনো ভারতীয়র মুখে এমন ভাষণ শোনে নি। কদিনের মধ্যেই লণ্ডনবাসীরা তাঁকে অন্তরে গ্রহণ করল। ভারত-বিখ্যাত মহিলা, স্বামীজীর অন্যতম শিষ্যা মিস মার্গারেট নোবল্-এর সঙ্গে এ-সময়েই তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। আপন গুরুদেবের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার সম্পর্কে মিস নোবল্ তাঁর 'দি মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে লিখেছেন : নভেম্বর মাসের একটি রবিবাসরীয় হিম সন্ধ্যা। ওয়েস্ট এণ্ডের একটি বসবার ঘরে আগুনের দিকে পিছন ফিরে তিনি বসে আছেন : সামনে অর্ধ-বৃত্তাকারে শ্রোতাগণ। তিনি যখন প্রশ্নের পর প্রশ্নর উত্তর দিচ্ছিলেন, মনে হচ্ছিল তিনি সংস্কৃত কোনো গ্রন্থ থেকে আবৃত্তি করছেন—যা গীতধ্বনির সহিত তুলনীয়। তাঁর মনে নিশ্চয় এই প্রায়-অন্ধকার গোধূলি লগ্ন ভারতের কোনো গ্রামপ্রান্তে সূর্যাস্তে স্তূপ-সন্নিকটে অথবা বৃক্ষমূলে উপবেশিত জনৈক সাধু এবং তাঁর চতুস্পার্শের শ্রোতাদের কৌতুককর রূপান্তর বলেই বোধ হয়ে থাকবে। ইংলণ্ডে এমন অনাবিল ভাবে স্বামীজীকে আমি আর দেখি নি। পরিধানে গেরুয়া—মাঝে মাঝে এক একবার শিব শিব ধ্বনি, আর তাঁর মুখমণ্ডলে অপূর্ব কোমলতা পরিস্ফুট—যার সঙ্গে রাফায়েল চিত্রিত 'মিস্টিন চাইল্ডের' ললাট লিপি তুলনীয়। এই সময়ে তিনি

গীতা থেকে 'ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব', শ্লোকটির ব্যাখ্যা করে বললেন, সূত্রে গাঁথা বহু মণির মতো আমাতে সমস্ত রয়েছে।

বিবেকানন্দর কথা শোনবার জন্য এ সময় প্রচুর লোক আসত। তিনি কখনো কর্ম, কখনো পুনর্জন্মবাদ, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ প্রভৃতি বিষয়ের পর আলোচনা করতেন। অনেক সময় বসবার স্থানের অভাবে খালি মেঝেতে শ্রোতারা বসে পড়ত।

ফলে ইংলণ্ডে যাওয়ার আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া গেল। তিনি শুধু এখানে বেদান্ত প্রচার করতে চেয়েছিলেন। অথচ এখানে তিনি ভারতবাসীদের প্রতি ইংলণ্ডবাসীদের অন্তরে প্রেম অনুরাগ এবং সহমর্মিতা সঞ্চারিত করে তুললেন।

ইংলণ্ড সম্পর্কে বিবেকানন্দর ধারণা এখানকার মানুষ ঐতিহ্যাশ্রয়ী, ফলে আমেরিকার মতো হঠাৎ নতুন কিছু মতবাদ শুনলেই লাফিয়ে ওঠে না। অনেক ভেবে চিন্তে যুক্তি তর্কের মধ্য দিয়ে তা গ্রহণ করে। কিন্তু একবার গ্রহণ করলে আমেরিকানদের মতো দুদিন বাদেই তা ভুলে যায় না। সুতরাং এখানে কর্মের মাঝে বিবেকানন্দ অধিকতর মন সংযোগী হলেন।

কিছু দিন একনাগাড়ে প্রচার চালিয়ে যাবার পর তিনি হৃদয়ঙ্গম করলেন যে চারা গাছ সত্ত ইংলণ্ডের মাঠে রোপিত হল তা বৃক্ষে পরিণত হতে সময় নেবে সুতরাং আপাতত এই পর্যন্ত থাক বলে ন জন বিশিষ্ট বন্ধুর হাতে মঠের ভার অর্পণ করে আমেরিকায় ফিরে গেলেন।

তিনি প্রথমবার ইংলণ্ডে তিন মাস ছিলেন। এই স্বল্পকালে অল্প কথায় বিরাট বিষয়কে সহজ করে দেবার স্বাভাবিক ক্ষমতা দিয়ে বহুজনচিত্ত জয় করতে সক্ষম হন। প্রথম প্রথম দ্বিধার দোলায় দুললেও অচিরেই তাঁর শিষ্য শিষ্যারা তাঁকে আচার্যরূপে গ্রহণ করল।

স্বামী কৃপানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ ও মিস ওয়ালডো আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারে নিযুক্ত ছিল। ডিসেম্বর মাসে স্বামীজী তথায় ফিরে গেলেন। এবার তিনি কর্মযোগের পর বেশির ভাগ আলোচনা করেন। তাঁর এই বক্তৃতা মালা পরে 'কর্মযোগ' নামে প্রকাশ হয়ে বেরোয়। ছ' সপ্তাহ এক নাগাড়ে বক্তৃতা দিলেন। নিজে অবশ্য এসব বক্তৃতার প্রতিলিপি করান নি। শিষ্যেরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে লিপিবদ্ধ করেছিল। গডউইন নামে একজন এ-বিষয়ে বিশেষ পরিশ্রম করেছিল। বিবেকানন্দ গডউইন প্রসঙ্গে বলতেন, 'মাই ফেথফুল গডউইন।' তার মৃত্যুতে বলেছিলেন, আমার ডান হাত খসে গেল। ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে বোস্টনে তিনি মিসেস ওলিবুলের অতিথি হন।

আমেরিকার এই সব শহর নতুন করে স্বামীজীর ভাষণে মুখরিত হতে লাগল। একাধারে ক্লাস করিয়ে অনুশীলন ও অন্যদিকে আলোচনা দ্বারা জনগণ ক্রমশ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে ছাত্র সংখ্যা শিষ্য সংখ্যা বাড়তে লাগল। তাঁর উপদেশ, প্রদত্ত শিক্ষা ছাপার অক্ষরে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল অনেকে। পুস্তিকা ছাপা হল। বিক্রীও হতে লাগল প্রচুর সংখ্যায়। সকলে বেদান্তপাঠে অনুরাগী হয়ে উঠল। ২৪শে ফেব্রুয়ারী ম্যাডিসন স্কোয়ারে জ্ঞান-যোগ বিষয়ে তার ধারাবাহিক বক্তৃতার শেষ হয়। আমেরিকাবাসীদের হৃদয়ে তিনি এমন মন্ত্রের মতো কাজ করেন যার ফলে এনসাইক্লো-পিডিয়াতে একজন তাঁকে আমেরিকান বলে উল্লেখ করতে চেয়েছিলেন।

আমেরিকান মহিলা কবি এলা হুইলার উইলকক্স 'নিউইয়র্ক আমেরিকান' নামক কাগজে তার নামে বার বছর পরে লেখেন: বার বছর আগে কৌতূহলবশত স্বামার সঙ্গে বিবেকানন্দ নামে ভারতীয় দার্শনিকের ভাষণ শুনতে যাই। দশ মিনিট শুনতে না শুনতে

আমাদের মন এক সূক্ষ্ম ভাব রাজ্যে আরোহণ করল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর কথা শুনে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকবার নতুন প্রেরণা আশা ও বিশ্বাস নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।...বিবেকানন্দ এক নতুন কথা নিয়ে আমাদের কাছে এসেছেন। যার জন্য তিনি বলেন, তোমরা সত্য উপলব্ধি কর, তোমাদের অন্তরে জ্ঞানের উন্মীলন হোক।

হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের মিস্টার ফক্স স্বামীজীকে আমন্ত্রণ জানালেন। সেখানে তিনি অধ্যাপক ও যুবক ছাত্রদের সামনে প্রাঞ্জল ভাষায় বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে এক গুরুগম্ভীর বক্তৃতা দিলেন। যা শুনে ওই পণ্ডিতমণ্ডলী ও আমেরিকার সেরা ছাত্রেরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে পড়ল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁকে প্রাচ্য দর্শনের অধ্যাপকের পদ নিতে বলেন। উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি সন্ন্যাসী চাকরি করব কি করে!'

'বোস্টন ট্রান্সক্রিপ্ট' এ বিষয়ে লেখে, 'স্বামীজী প্রমাণ করেছেন ধর্ম শুধু কতকগুলি কথার কথা বা চমৎকার ভাব মাত্র নহে। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সেই ভাব দেখাতে পারলেই তবে ধর্ম লাভ হয়। মর জীবনের মধ্যেই বেদান্ত ধর্মর সাহায্যে মানুষের পক্ষে দেবত্ব লাভ সম্ভব।'

১৮৯৬ সালে নিউইয়র্ক বেদান্তসভা স্থাপিত হয়। ইতোমধ্যে বিবেকানন্দর 'রাজযোগ', 'কর্মযোগ' ও 'ভক্তিযোগ' প্রকাশিত হয়। 'রাজযোগ' গ্রন্থ নিয়ে অ্যানাটমি ও সাইকোলজিস্ট পণ্ডিতদের মধ্যে আলোড়নের ঝড় বয়ে গেল।

১৮৯৬ সালেই ইংলণ্ড ফিরে এলেন তিনি।

ইংলণ্ডে অর্ধসমাপ্ত কার্যকে পূর্ণ রূপ দেবার চিন্তা তাঁর মনে উদিত হয়।

আমেরিকায় বাসকালে স্বামীজী নানা কর্মে নানা আলোচনার মধ্যে যে অবসর পেয়েছেন সে সময় গল্প সাক্ষাৎকারে অতিবাহিত করেন।

মিসেস ওলিবুলের গৃহে একদা রাত্রে আহার কালে হার্ভাডের বিশ্ববিখ্যাত দর্শনের অধ্যাপক উইলিয়ম জেমসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। অনেক রাত পর্যন্ত উভয়ের আলোচনা চলে। মিস্টার জেমস বিদায় নিলে ওলিবুল জিজ্ঞাসা করেন, 'জেমস্‌কে কেমন লাগল ?'

স্বামীজী বললেন, 'বেশ লোক, খাসা লোক।'

একদিন এক বাড়িতে এক রমণী 'হে ফিবার' নামে এক রকম জ্বরে ভুগছে। স্বামীজী হঠাৎ তাকে বললেন 'তোমার জ্বর সারিয়ে দেব !' 'তা যদি পারেন তো খুব ভাল হয়।' স্বামীজী তার সামনে এসে বসলেন। রোগীর হাত দুটো নিজের হাতের উপর রাখলেন। তার পর চোখ বুজে নিশ্চলভাবে বসে থাকলেন। ক্রমে তাঁর হাত দুখানা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সমস্ত শরীর শক্ত। একটু পরেই চোখ খুলে তিনি ঘরের বাইরে চলে গেলেন। রমণীর জ্বর ছেড়ে গেল।

বোস্টনে ওলিবুলের বাড়িতে থাকাকালীন তার অনুরোধে কেম্ব্রিজের মেয়েদের সামনে হিন্দু রমণীর আদর্শ নামে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ভারতীয় নারীর চরিত্র তাদের মাতৃত্ব প্রভৃতির উদাহরণ তুলে উদাত্ত কণ্ঠে

বললেন, ভারতের নারীদের সম্পর্কে যে ধারণা আমেরিকায় প্রচলিত তা মিথ্যা।

ইংলণ্ডে সারদানন্দ স্বামীজীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অনেক দিন পর গুরুভাইকে দেখে তাঁর খুব আনন্দ হল। মঠের খবর নিলেন। মে মাসের প্রথম দিকে ক্লাস খুলে জ্ঞানযোগ শিক্ষা দিতে লাগলেন। শ্রোতা ছাত্র প্রত্যেকের হৃদয় তাঁর গভীর জ্ঞানের সন্ধান পেয়ে ধর্মভাবের প্রেরণায় প্রখর হল।

ক্লাস নেওয়া ছাড়া আরো অনেক কাজ করতে হত। সভা সমিতিতে যোগদান বা কারো বাড়িতে বক্তৃতা দিতে হত। ইতোমধ্যে অ্যানি বেশান্তের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। সভা-সমিতিতে তিনি ক্রমেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠলেন। অনেকেই তাঁর সান্নিধ্য পাবার জন্য উৎসুক ছিল। তাঁর কথা শুনতে আগ্রহী। প্রত্যেককেই তিনি সমান ভাবে গ্রহণ করতেন। একটি সভায় পাকাচুল এক বন্ধু তাঁর বক্তৃতার পর বললেন, 'আপনি খুব ভাল বলেছেন এজন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু আপনি নতুন কিছু বলেন নি।'

বিবেকানন্দ উত্তর দেন, 'আমি যা বলেছি তা শুধু সত্য মাত্র। এ সত্য হিমালয়ের মতো, মানুষ জাতির মতো এমন কি ঈশ্বরের মতো প্রাচীন।'

এ-সময়ে স্বামীজীর সাহায্যে স্টার্ডি সাহেব 'নারদ ভক্তিসূত্র' গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করতে সক্ষম হন।

লণ্ডনে বিশ্ববিখ্যাত মনীষী ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে বিবেকানন্দর দেখা হয়। ম্যাক্সমুলার শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনেছিলেন। বিবেকানন্দকে তিনি নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। তিনি বিবেকানন্দকে প্রচুর শ্রদ্ধা দেখান। নিজে স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেন। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যকে তো আর রোজ দেখতে পাব না।

ম্যাক্সমুলার স্বামীজীকে প্রশ্ন করলেন, 'জগতে রামকৃষ্ণকে প্রচার করবার জন্য আপনারা কি করছেন ?' শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণ জীবনী জানতে চান—বলেন, পুরো বিষয় অবগত হলে গ্রন্থ লিখবেন। বিবেকানন্দ সারদানন্দের উপর যতদূর সম্ভব উপকরণ সংগ্রহের ভার দিলেন। সেই তথ্য নিয়ে ম্যাক্সমুলার পরে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

ইংলণ্ডের কাগজ রক্ষণশীল, কোনো নতুন মতবাদ সহসা গ্রাহ্য করে না। তৎসত্বেও সব কাগজ বিবেকানন্দর বিষয়ে প্রচুর প্রসংশা করেছে নির্বিকারে। 'দি লণ্ডন ডেলী ক্রনিকল' ১৮৯৬ সালের ১০ই জুন লিখেছিল, 'স্বামীজা একজন বিখ্যাত বেদান্তবাদী। তাঁর ব্যবহার, চেহারা, দার্শনিক আলোচনার সরলতায় বোঝা যায় আমেরিকায় তাঁর এত খ্যাতি কেন। তাঁকে আঙুল তুলে কোনো ধর্মাবলম্বী বলে নির্দেশ করা যায় না। সমস্ত ধর্ম থেকেই তিনি যেন সার সংগ্রহ করেছেন।

স্বল্প সময়ের মধ্যেই বিবেকানন্দ ইংলণ্ডে অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাতে সকল প্রকার লোকের মধ্যে প্রগাঢ় ধর্মচিন্তার উদ্ভব হয়েছিল। চিন্তার ক্ষেত্রে একটা নতুনত্ব যে অনিবার্য সকলেই তা ধরে নিয়েছিল—অনেকে এমন মনে করেছে স্বামীজীর শিক্ষা থেকে একটি নতুন দল গড়ে উঠবে। অথচ বিবেকানন্দ বলতেন, 'আমি কোনো দল গঠন করতে আসি নি—দল গঠনের উদ্দেশ্য আমার নয়, আমি সন্ন্যাসী এবং প্রচার করতেই এসেছি।'

এর মধ্যে অনেকেই স্বামীজীর দীক্ষা গ্রহণ করে তাঁকে গুরুত্বে বরণ করে। তাদের মধ্যে মিস মার্গারেট নোবলের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। মিস নোবল্ পরে ভগিনী নিবেদিতা নামে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

জুলাই মাস পর্যন্ত ইংলণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিলেন বিবেকানন্দ। জুলাই মাসের শেষাশেষি বিবেকানন্দ ইংলণ্ড ত্যাগ

করলেন। প্রথমে প্যারীতে এক রাত কাটিয়ে জেনেভা গেলেন। জেনেভায় তিন দিন কাটল। কিল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক তাঁকে বিশেষ করে একবার নিজের আবাসে আমন্ত্রণ জানালেন। লণ্ডন হয়ে চিঠিটা রি-ডাইরেক্ট হয়েছে।

সুইজারল্যাণ্ড জার্মানী হয়ে যাওয়া স্থির হল। সুইজারল্যাণ্ডের লুসার্নে উপস্থিত হলেন স্বামীজী। লুসার্ন থেকে হাইডেলবার্গ। তারপর বার্লিন। জার্মানীতে জার্মানদের সম্পর্কে নানা আলোচনা করলেন। বার্লিন শহর দেখে তাঁর প্যারীর মতো ভাল লাগল। বার্লিন থেকে সোজা অধ্যাপক ডয়সনের বাড়িতে চললেন। অধ্যাপক আগমন বার্তা পেয়ে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। দশটায় স্বামীজী চললেন সাক্ষাতের জন্য।

নানা আলোচনা কথা উভয়ের মধ্যে হল। ডয়সন বিবেকানন্দের যুক্তি স্বীকার করে নিলেন। আনন্দের মধ্যে দিয়ে সময় অতিবাহিত হল। ডয়সনের অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হলেন তিনি। ডয়সন ভেবেছিলেন, স্বামীজী বেশ কয়েকদিন থাকবেন এবং সে অবসরে তাঁর সঙ্গে দর্শন নিয়ে নানাবিধ আলোচনা করা যাবে। ইংলণ্ডে ফিরে যাওয়ার তাড়া থাকায় বিবেকানন্দ বিদায় নিলেন। হামবুর্গ পোঁছে তিন দিন থাকলেন। অধ্যাপক ডয়সনের সঙ্গে পুনর্মিলিত হলেন সেখানে। এক সঙ্গে হল্যাণ্ড গেলেন। হল্যাণ্ড থেকে রওয়ানা হলেন লণ্ডন অভিমুখে।

হ্যামস্টেডে কদিন বিশ্রাম নিয়ে আবার কর্মোদ্যম শুরু হল। ‘রাজযোগ’ ‘ধ্যানযোগ’ সম্পর্কে উপদেশ দিতে লাগলেন। প্রধান বিষয় ছিল জ্ঞানযোগ। সরল করে ব্যাখ্যা করে চলেছেন স্বামীজী। সঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ। তিনি ভারত থেকে কেবল এসেছেন। স্বামীজী স্থির করেছেন দেশে ফিরে যাবেন। যাওয়ার আগে তাঁর স্থানে সক্ষম

কাউকে রেখে যেতে চান। সেই অনুসারে অভেদানন্দকে প্রস্তুত করছেন। ব্লুমবেরী স্কোয়ারে নিজের জায়গায় বক্তৃতা করতে অভেদানন্দকে সুযোগ দিলেন। অভেদানন্দ স্বামীর বিলেতে এই প্রথম ভাষণ; যা শুনে প্রীত হলেন বিবেকানন্দ।

নভেম্বর মাসে ভারতে আসা স্থির হয়ে গেল। মাদ্রাজ ও কলকাতায় খবর পাঠালেন। তাঁর সঙ্গে বহুলোক ভারতের দিকে রওয়ানা দেবার জন্য প্রস্তুত হল। লণ্ডন ত্যাগের আগের রবিবার পিকাডিলিতে বিশেষ এক সভা হয়। বিদায়ী সভায় প্রচুর জনসমাগম হল এমন কি শেষ পর্যন্ত দাঁড়াবার জায়গা রইল না। সকলেই শোকাভীভূত। অপলক চোখে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে আছে, স্বামী বিবেকানন্দ ইংলণ্ড-বাসীর প্রতি বিদায় বাণী উচ্চারণ করবেন। চতুর্দিকে সজ্জিত। অদ্ভুত একটি পবিত্র পরিমণ্ডল। সঙ্গীতের মৃদু গুঞ্জরণ। ধীরে ধীরে সভায় এলেন বিবেকানন্দ। প্রথমে ভক্ত ও শিষ্যদের শ্রদ্ধা নিবেদন। তারপর অভিনন্দন পাঠ। সর্বশেষ অভিনন্দনের উত্তর দিতে মঞ্চে উঠলেন স্বামীজী। গাঢ় এবং অদ্ভুত তাঁর কণ্ঠ। 'আবার দেখা হবে নিশ্চয়।' সভার পর যে নিস্তব্ধতা তাই শোক হয়ে আকাশে লম্বিত।

১৬ই ডিসেম্বর ১৮৯৮ লণ্ডন ত্যাগ করলেন বিবেকানন্দ। বিজয়ী বীর ও ফিরে চললেন আবার জন্মভূমিতে। সঙ্গে শিষ্যরা। ইংলণ্ড, আমেরিকা বা প্রবাসে বিবেকানন্দর সাফল্য সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল 'ইণ্ডিয়ান মিরর' কাগজে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন।

একজন প্রত্যাবর্তনকালে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'স্বদেশ এখন আপনার কাছে কেমন লাগবে?'

তিনি উত্তর দেন, 'এখানে আসবার সময়েও ভারতকে ভালবাসতাম। এখন তার প্রতি ধূলিকণা, বায়ু আমার কাছে পাবত্র। ভারতভূমি পবিত্র ভূমি। হিন্দুস্থান আমার তীর্থস্থান।'

ফিরবার পথে কিছু দেশ ঘুরে চললেন। প্রথমে মিলান। সেখান থেকে রোম। রোম সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল এটি একটি মহামিলনকেন্দ্র। ঘুরে ঘুরে ইতিহাসের অতীত সব স্মৃতি দেখলেন। ৩০শে জানুয়ারী নেপলস্ থেকে জাহাজ ছাড়ল। ভূমধ্যসাগরের মধ্যে বিবেকানন্দ স্বপ্ন দেখলেন। একজন ঋষি সামনে এসে বললেন, 'তুমি এখন ক্রীট দ্বীপের কাছে। এখানেই প্রথম খৃস্টধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল। এখানকার খেরাপুটি সম্প্রদায়ের আমি একজন…'আরো কি যেন বলেছিল লোকটা, ঠিক মনে নেই স্বামীজীর; বোধ হয় এসেনী। শোনা যায় যীশু এই সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। ঘুম ভাঙতেই বিবেকানন্দ ছুটে গেলেন ডেকে। একজন জাহাজের কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন ক'টা বাজে?' 'বারটা।' 'আমরা কোথায় এসেছি?' ক্রীট দ্বীপের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে।' স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের মিল দেখে অবাক হলেন তিনি।

এডেন থেকে কলম্বোর পথে দু'টি বিদেশী মিশনরির সঙ্গে তর্ক হয়। তারা তাঁকে হিন্দুধর্ম আর খৃস্টধর্মের প্রভেদ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে উত্তরে তিনি ছোট ছোট কতকগুলি প্রশ্ন করলেন। তারা উত্তর দিতে অসমর্থ হয়ে আবোল-তাবোল গালি-গালাজ করতে লাগল। বিবেকানন্দ আর সহ্য করতে পারল না। একজনের গলায় হাত দিয়ে ভীষণ স্বরে বললেন, 'যদি ফের আমার ধর্মকে কিছু বলো, তবে জাহাজ থেকে তুলে জলে ফেলে দেব।' স্বামীজীর সেই স্থির অচঞ্চল মূর্তি দেখে ভেড়ার থাকার মতো কাঁপতে কাঁপতে তারা বলল, 'মশায় এবার ছেড়ে দিন, আর করব না।'

বিবেকানন্দর স্বদেশ প্রত্যাগমন একটি উল্লেখ্য ঘটনা। নবীন এই সন্ন্যাসীর প্রবাস বিজয় কাহিনী ভারতবাসীর মনে যে অলৌকিক প্রেরণার সৃষ্টি করে ছিল তাই বর্ধিত হল তাঁর উপস্থিতিতে। চারপাশে

তাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য নানা স্থানে সভার উদ্যোগ হতে থাকে। বিবেকানন্দ এ-সবের কিছুই জানতেন না। কলম্বো জাহাজ ঘাটে নামতেই বিরাট অপেক্ষমান জনতাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য উপস্থিত দেখলেন, তাঁকে সকলেই দেখতে চায়।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সকলে তীরে নামলেন। সেখান থেকে সোজা অভ্যর্থনা সভায়।

স্টিমলঞ্চে করে স্বামীজী তীরে এলেন।

তাঁর দর্শনার্থী জনসাধারণ আবেগে ছাতা লাঠি রুমাল প্রভৃতি বস্তু ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করে আনন্দ প্রকাশ করছিল। পুষ্পমালা পরানো হল বিবেকানন্দর কণ্ঠে। কনসার্ট বাজছিল ভারতীয় সুর অনুকরণে। অভ্যর্থনা সভার মঞ্চে তিনি আসন গ্রহণ করলেন। অভিনন্দন পাঠ সমাপ্ত হল স্বামীজী উত্তর দেবার জন্য উঠলেন। বললেন, আমি আজ আপনাদের আন্তরিকতায় পরম প্রীত—এই সম্বর্দ্ধনা থেকে ভারতবাসী আজো কেমন ধর্মপ্রাণ তাই প্রমাণ করে—তাই এ সম্মান আমার নয়, একটি নীতির প্রতিই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। হিন্দুজাতিকে বাঁচতে হলে ধর্মই তার একমাত্র অবলম্বন।

শনিবার দিন অপরাহ্ণে 'ফ্লোরাল হলে' তিনি প্রথম বক্তৃতা করলেন। বক্তব্য বিষয় পুণ্যভূমি ভারত। এরপর কলম্বো পাব্লিক হলে অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে দ্বিতীয় বক্তৃতা দেন।

কলম্বো থেকে ক্যাণ্ডি। ক্যাণ্ডি সিংহলের বিখ্যাত পার্বত্য স্বাস্থ্য-নিবাস। এখানেও সেই অভ্যর্থনা। বিপুল জনতা তার চারপাশে সমাগত। ক্যাণ্ডি দর্শন সমাপ্ত করে পুনরায় যাত্রা শুরু হল।

সিংহলের পুরনো সভ্যতার সাক্ষী অনুরাধাপুরে এলেন বিবেকানন্দ। ছ হাজার বৎসর পূর্বের একটি মহীয়ান নগর। এখানের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রচুর ইতিহাসের কাহিনী উদ্ধার পেয়েছে। ঘুরে ঘুরে অতীত

জগতে বিচরণ করলেন তিনি। তারপর অনুরাধাপুর হয়ে জাফনা। জাফনায় সমবেত হিন্দুরা তাঁকে অভিনন্দন জানান।

জাফনা থেকে ভারত অভিমুখে রওয়ানা দিলেন তিনি। একটি জাহাজ ভাড়া করে জলপথে সকলে পাম্বান দ্বীপে এলেন, স্থির ছিল রামেশ্বরে রামনাদ মহারাজের ওখানে যাবেন। কিন্তু মহারাজ নিজেই তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য পাম্বানে হাজির। মহা আনন্দে তিন দিন এখানে অতিবাহিত হল। এখান থেকে রামেশ্বরের মন্দির দেখতে গেলেন। রামেশ্বর দর্শনের পর ভারতের মাটিতে তিনি প্রথম রামনাদের মহারাজের আতিথ্য গ্রহণ করলেন। তাঁর রাজ্যে গেলেন। তাঁকে রাজকীয় অভিনন্দন জানানো হল। প্রত্যুত্তরে বিবেকানন্দ জাতীয় জীবনের উন্নতি ও গঠনের জন্য সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশসহ নানা বিষয় বললেন। সুদীর্ঘ তমসা আজ বিলীন—মহানিদ্রার পর সুপ্তোত্থিতের মতো শব দেহ নতুন প্রাণ পেয়ে জাগছে। কুম্ভকর্ণের ঘোর ঘুম ভেঙে নিদ্রার অবসান হচ্ছে…'

রামনাদের পর মান্দ্রাজ অভিমুখে চললেন স্বামীজী। পথে মনমতুরায় স্থানীয় লোকদের অভিনন্দন গ্রহণ করতে হল। মনমতুরা থেকে কুম্ভকোণম হয়ে মান্দ্রাজে চলেছেন। মান্দ্রাজ রেল স্টেশনেই বিপুল জনতা তাঁকে সমাদর করবার জন্য উপস্থিত। পথে প্রতিটি স্টেশনেই প্রচুর জনসাধারণ তাঁর দর্শন পাবার জন্য হাজির ছিল। মায়াবরম স্টেশনের প্লাটফরমের উপরেই তাঁকে স্থানীয় অধিবাসীগণ স্বাগত জানিয়ে অভিনন্দন দিল। মান্দ্রাজবাসী আপামর সকলের এই ভক্তি তাঁকে আপ্লুত করে তুলল। তিনি মুক্তকণ্ঠে সকলকে আশীর্বাদ জানালেন।

মান্দ্রাজ নগরী যেন তাঁর প্রত্যাবর্তনে নতুন সজ্জা পরে অপেক্ষা করছিল। বিভিন্ন তোরণ, পতাকা পুষ্পমালায় শোভিত এই নগরীতে

তিনি পদার্পণ করলেন। নানা স্বাগত ধ্বনি সুমধুর হয়ে বেজে উঠল। পথের পাশে গৃহের ছাদে অলিন্দে জানালায় হাজার হাজার মানুষ। ইতিপূর্বে মান্দ্রাজে এমন সমারোহ আর হয় নি।

সমস্ত পথ পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তিনি গমন করলেন। এখানে তিনি ন' দিন ছিলেন। তার মধ্যে ছ'টি ভাষণ দেন। প্রতিটি বক্তৃতায় ভারতের নব অভ্যুদয়ের বাণীই ধ্বনিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধর্মের উদ্দীপনা দেখে তিনি বলেন, 'দেখ যেন এ আগুন নিবে না যায়।' এই সময় বিদেশ থেকে তাঁর ভক্ত ও অন্যান্য গুণমুগ্ধরা প্রচুর চিঠি লেখেন। পত্রের প্রতি ছত্রে স্তুতি শ্রদ্ধা পরিপূর্ণ। কিন্তু সর্বত্যাগী এই বীর সন্ন্যাসী তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি কারণ তিনি নিন্দা-স্তুতির ঊর্ধ্বে ছিলেন।

মান্দ্রাজ থেকে সোজা কলকাতা অভিমুখে রওয়ানা দিলেন। তার কমনীয় কান্তি আর প্রতিভা ভাস্বর দেবমূর্তি কলকাতাবাসীদের হৃদয়ে যেন উৎসাহ গেঁথে দিল। পশুপতিনাথ বসুর বাগবাজারের বাড়িতে গুরুভাইদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিকেলে আলমবাজার মঠে এসে উঠলেন।

সাতদিন অবিশ্রান্ত কেটে গেল। প্রত্যহ তিনি বিশ্রামের সময় পর্যন্ত পাচ্ছিলেন না। ১৮৯৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী। মহানগরীর জনসাধারণের পক্ষ থেকে তাঁকে থেকে অভিনন্দন জানানোর দিনস্থির ছিল। অভিনন্দনের উত্তরে কলকাতার যুবকদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'—ওঠ, জাগ —সুসময় সমুপস্থিত। আমি আমার দেশের উপর বিশ্বাস রাখি—বিশেষ করে দেশের যুবকদের পরে। সকলে এগিয়ে এসে প্রাপ্য বরলাভে বরেণ্য হও।

ঠাকুরের জন্মতিথি উৎসবের দিন এসে পড়ল। এ-বছর উৎসাহ আর উদ্দীপনার শেষ নেই। অন্যান্য গুরুভাইরা বিবেকানন্দকে পেয়ে

আত্মহারা। পঞ্চবটীতে ঠাকুরের প্রচুর ভক্ত উপস্থিত। নাট্যাচার্য গিরিশ ঘোষও ছিলেন। তাঁকে প্রণাম করে স্বামীজী বললেন, 'ঘোষজা সেই একদিন আর এই এক দিন।'

প্রতিনমস্কারের পর গিরিশ ঘোষ উত্তর দিলেন, 'তা বটে, কিন্তু ইচ্ছে হয় আরো দেখি।' তাদের মধ্যেকার এই আলাপের তাৎপর্য অন্য কেউ উপলব্ধি করতে পারল না।

উৎসব শেষে সকলকে নিয়ে মঠে ফিরলেন। ফেরবার পথে বিদেশী ভক্তদের বললেন, 'সাধারণের জন্য বাইরের উৎসব অনুষ্ঠানের প্রয়োজন —কারণ এই সব আড়ম্বরের মধ্যে দিয়ে ধর্মের বিরাট ভাব সব সময় তাদের অন্তরে ঢুকে যায়।

এই সময়ে তিনি গোপাললাল শীলের কাশীপুরের বাড়িতেই প্রায় থাকতেন। মিশতেন সকলের সাথে। আলাপ-আলোচনা করতেন ধর্মবিষয়ে। তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল, শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়ের পর। তাদের প্রতি তাঁর স্নেহ উৎসাহ বর্ষিত হত। ধমক দিতেও ছাড়তেন না তিনি। সর্ববিষয়ে মাতৃভূমির সেবা করবার জন্য প্রস্তুত হতে বলতেন। পরের কাজে নিজেকে ব্যয় করাই ছিল তাঁর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। কারণ মানসিক শান্তির বীজ সেবার মধ্যেই সুপ্ত। কথাপ্রসঙ্গে একদিন জনৈক রামকৃষ্ণ ভক্ত বলেন, 'তুমি যে কেবল সেবার কথা, দান আর পরোপকার সম্পর্কে বলো, ও সবের মধ্যেও মায়া আছে। যদি মুক্তিই চরম লক্ষ্য হয় তবে এ-সব মায়া কাটানোও তো দরকার।'

স্বামীজী হেসে উত্তর দিলেন, 'মুক্তির এই ইচ্ছেও কি মায়ার অন্তর্গত নয়—বেদান্ত বলছে আত্মা চিরমুক্ত—তবে আবার মুক্তির চেষ্টা কেন?'

প্রশ্নকারী চুপ হয়ে গেলেন।

ববেকানন্দ কর্মযোগ প্রচারের পক্ষপাতি ছিলেন। বৈরাগ্য, সংসার বিমুখীনতা, ধ্যানধারণা যতটা সহজ মানুষের পক্ষে তার কাছে কর্মোৎসাহ কঠিন পথ। এই ধারণা তাঁর মনে বাসা বেঁধেছিল। তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন, সত্ত্বগুণের নামে সমস্ত দেশ আলস্য ও জড়তায় নিমজ্জিত ; আপন সম্পর্কে হীন ভাবনা ক্রমে মানুষকে হীন করে ফেলছে। সুতরাং এই আত্মগ্লানি আত্মহত্যার সামিল। তাই তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন, আমরা জ্যোতির সন্তান—বিশ্বজগতের জ্যোতির মধ্যে ভেসে আছি।'

একদিন একজন স্বামীজীকে অবতার ও মুক্তপুরুষের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'বিদেহ মুক্তিই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ অবস্থা। পৃথিবীতে আবির্ভূত যুগপুরুষ মাত্রেই মুক্তিকে তাদের শক্তির মধ্যে অনুভূত করেন, তাই তাঁরা পরের মুক্তিতেই সাহায্য করেন নিজের মুক্তি চান না।' দেশের অধঃপতনে তিনি ব্যথিত বলেই নিজের উদাহরণ দিয়ে সকলকে চালিত করতে চেয়েছেন। লোকচরিত্রের আমূল পরিবর্তন না করলে আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি অসম্ভব। সেজন্য তিনি বলতেন, শক্তি চাই, শক্তিমান হও। উপনিষদ শক্তির খনি। আজীবন সংগ্রামী মনোবৃত্তিই প্রার্থিত, শক্তি দ্বারা সেই সংগ্রাম স্থায়ী করা দরকার। যে জাতের এ বিষয়ে উদ্যোগ ও আত্মরক্ষার চেষ্টা নেই তার ধ্বংস অনিবার্য। নিজের উপর বিশ্বাস রাখলেই মানুষ অসাধ্য সাধনে সক্ষম। শিষ্যদের এই মন্ত্রই একমাত্র মন্ত্র বলতেন—সকলে এই সত্য গ্রহণ কর। একদিন স্বামীজীর কাছে প্রাণায়াম সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে দু'জন সমাধান জানতে যায়। তারা কিছু প্রশ্ন করবার পূর্বেই ওই বিষয়ে তিনি দীর্ঘকাল ধরে নানা আলোচনা করেন। মনের কথা এমন ভাবে অজ্ঞাতে জেনে উত্তর দেওয়ায় তারা অবাক। এই বিস্ময় প্রকাশের উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি এ-রকমে জেনে নিয়ে বলতে পারি'—এমন কি জাতিস্মরের মতো তিনি পূর্বজন্মাদির কথাও জানেন, বললেন।

কলকাতায় বিবেকানন্দর হঠাৎ স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকের পরামর্শে দার্জিলিং গেলেন। সঙ্গে অনেকেই গেল। সেখানকার বাসিন্দা মিস্টার এম, এন, ব্যানার্জি স্বীয় গৃহে তাঁদের সমাদরে থাকতে দিলেন। এখানে একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। মতিলাল মুখোপাধ্যায় নামে একজন সে বাড়িতে বাস করছিল। একদিন তার ভীষণ জ্বর। বিকারে ভুল বকছে।

স্বামীজী তার ঘরে ঢুকে মাথায় হাত দিতে মন্ত্রের মতো জ্বর উবে গেল। একটু বাদেই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে বসল।

ছু মাস বাদে আবার কলকাতায় ফিরলেন বিবেকানন্দ। প্রথমে এসেই ক'জনকে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা দিলেন। সন্ন্যাস নিতে ইচ্ছুকদের বলতেন, 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।' তোমরা মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রতগ্রহণে এগিয়ে এসেছ—ধন্য তোমাদের জননী। 'আত্মনো মোক্ষায়াং জগদ্ধিতায় চ—এই সন্ন্যাসের আসল উদ্দেশ্য। বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম।'

# ৭

১৮৯৭ সালের ১লা মে বলরামবাবুর বাড়িতে সকল ভক্ত ও সন্ন্যাসী ভাইরা উপস্থিত। বিবেকানন্দ তাদের সামনে একটি সংঘ স্থাপনের প্রস্তাব করলেন। সকলে তার প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। গিরিশ ঘোষ সংঘের নামকরণ করলেন, 'রামকৃষ্ণ প্রচার।' পরে অবশ্য তা 'রামকৃষ্ণ মিশন' নামে পরিবর্তিত হল।

মিশনের উদ্দেশ্য : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব জগতের মঙ্গলের জন্য যে-সব সত্য উপদেশ দিয়েছেন, যার জন্য প্রাণপাত করেছেন; তার প্রচার এবং কর্মক্ষেত্রে যোগ্য ব্যবহার। সাধারণের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তায় কল্যাণকে যুক্ত করা ও তাদের জ্ঞানের পরিধির বিস্তৃতি দান। সঙ্গে শিল্প-সংস্কৃতির উন্নতিবিধান। রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক সেই বিবর্জিত।

মূল সভাপতি বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী যোগানন্দ কলকাতা কেন্দ্রের সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচিত হলেন। প্রতি রবিবার বলরামবাবুর বাড়িতে সভা বসবে। শাস্ত্রপাঠ বক্তৃতা আলোচনা প্রভৃতি অন্যান্য কাজ নির্দিষ্ট হল। তিন বছর এখানেই সংঘের মিলন হত। প্রথম দিকে অবশ্য ওই মিশনের প্রতি সকলের সপ্রাণ সাড়া ছিল না। বিবেকানন্দ বারংবার তাঁদের এ বিষয়ে মনোযোগী করে তুলতে লাগলেন। কারণ তিনি গুরুর আশীর্বাদ ছাড়াও রামকৃষ্ণদেবের ভিতরে

অবস্থিত প্রত্যেকটি মৌল গুণকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন ; সর্বভূতে প্রেম, অপরের দুঃখে বেদনা, করুণা, ক্ষমা ইত্যাদি বৃত্তি স্বভাবজ হয়ে গিয়েছিল তাঁর অন্তরে। এবং গুরুকে আত্মসাৎ করতে পারার জন্যই মুক্ত কণ্ঠে ভয়হীন ভাবে সকল বাধা অতিক্রম করে রামকৃষ্ণর কল্পনাকে রূপদানে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই।

রামকৃষ্ণদেবের এই প্রচারে সেবার প্রতিষ্ঠা অভিযানে এমন কি যোগানন্দ স্বামীও সংশয়ী হয়েছিলেন। তাঁর মতো অন্য এক শিষ্যও একদিন তাকে এই দ্বিধা ব্যক্ত করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, তোরা ধর্মের কি জানিস। প্রভুর গুণ কীর্তন করে কান্নাই সার—ভাবছিস এতেই মুক্তি, শেষ দিনে রামকৃষ্ণদেব এসে তোদের স্বর্গে নিয়ে যাবেন হাত ধরে—ভগবান যেন খেলনা, খুঁজলেই পেয়ে যাবে মানুষ।' আমার কাছে ও-সব রামকৃষ্ণ টামকৃষ্ণ বলা বৃথা—আমি কারু দাস নই, নিজের মুক্তি গ্রাহ্য না করে যে পরের সেবা করবে আমি তারই দাস। বলতে বলতে ভাবমুগ্ধ বিবেকানন্দের চোখ অশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

কলকাতায় এ-ভাবে প্রত্যহ নানা জনের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে আলোচনা করতে হত। তেজ, উৎসাহ, উদ্দীপনায় তিনি জ্বলন্ত সূর্য যেন—ফলে উপস্থিত সকলকেই তিনি আলোকিত করে তুলতেন। দীপ্তি দিতেন। ইতিহাস দর্শন জীবন সব নিয়ে সমান আগ্রহ তাঁর। একদিন ম্যাক্সমুলারের প্রসঙ্গ এসে পড়লে বিবেকানন্দ তাঁর সম্বন্ধে বললেন, 'তিনি যেন স্বয়ং সায়ণ—কি অদ্ভুত অধ্যবসায়, কি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য! বৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রীকে দেখে আমার বশিষ্ঠ-অরুন্ধতীর কথা মনে হয়েছিল।'

কিছুদিন বাদে হাওয়া বদলের জন্য আলমোড়া গেলেন বিবেকানন্দ। এখানে বিপুল সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রেষ্ঠ পর্বত হিমালয়কে লক্ষ্য করে

বললেন, হিমালয়ের সঙ্গে আমাদের স্মৃতি অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। ভারতের ধর্মের ইতিহাস থেকে হিমালয় বর্জিত যে অংশ তা নগণ্য। এই পর্বত যেন আমাদের ঔদার্যের সাক্ষী। এখানে তাই একটি কেন্দ্র স্থাপিত হওয়া আবশ্যক, যা শান্তি, নির্জনতা ও ধ্যানের মাধুর্যে পূর্ণ থাকবে। স্বামীজীর স্বাস্থ্য এখানে কিছুটা উন্নত হয়ে উঠছিল, এমন সময় ভারত প্রত্যাগত ডাক্তার ব্যারোজ হঠাৎ আমেরিকায় তাঁর নামে কাগজে কাগজে কিছু কলঙ্ক রটাতে শুরু করে। যার বিরোধিতা করা স্বামীজীর কাছে খুবই অশোভন মনে হয়। তবু এই বিষয়ে তাঁকে প্রায়ই চিঠিপত্র লিখতে হচ্ছিল। নিজের সম্পর্কে নির্দোষিতা প্রমাণ বা ব্যারোজের বক্তব্য খণ্ডন তা নয়—শুধু আপন বিষয়ের সত্যকে ব্যক্ত করা। যদিও ব্যারোজ সাহেবের বিরোধিতা সত্বেও আমেরিকা বা পাশ্চাত্যে তাঁর প্রভাব যে ক্রমশ বিস্তারিত তার প্রমাণ সারা বুলের চিঠি পড়লেই পাওয়া যায়। বেদান্ত বিষয়ের প্রভাব বিখ্যাত লেখক এমারসনের লেখাতেও উল্লিখিত।

আলমোড়ায় বিশ্রাম শেষ করে পুনরায় কর্মে অবতীর্ণ হবার জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন। বিদায়ের পূর্বে সকলের আগ্রহে একটি বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। ইংলিশ ক্লাবে সীমিত স্থানের জন্য জেলাস্কুলেও বক্তৃতা দিতে হল। বিবেকানন্দ সেখানে হিন্দীতে ভাষণ দেবেন। এ-পর্যন্ত তিনি হিন্দীভাষায় কোনো বক্তৃতা করেন নি। কিন্তু এখানে বক্তৃতা শুরুর পর ভাষার জন্য বক্তব্যের কোনো পার্থক্যই দেখা গেল না। সকলে এই সর্বজয়ী প্রতিভার অস্বাভাবিক বিকাশ দেখে অবাক।

আলমোড়া থেকে বিদায় নিয়ে উত্তর ভারত ভ্রমণ শুরু হল। এ-সময়কার তাঁর বহু বক্তৃতাই হিন্দী ভাষায়। প্রথমে বেরিলিতে গেলেন। চারদিন অবস্থানের পর আম্বালা। বেরিলিতে একজনকে তিনি বলেন, আর মাত্র পাঁচ-ছ বছর বাঁচবেন। তাঁর অনুমান সত্যে পরিণত

হয়েছিল। আম্বালায় এক সপ্তাহ কাটল। এবার লাহোর। লাহোর থেকে অমৃতশহর। গুরু নানকের দেশ। অমৃতশহরের পর রাওয়ালপিণ্ডি গেলেন। রাওয়ালপিণ্ডিতে আবার শরীর খারাপ হয়ে পড়লে মরি পাহাড়ে চলে গেলেন। কদিন মরিতে কাটিয়ে কাশ্মীরে যান।

শ্রীনগরে সকল শ্রেণীর লোক তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। প্রত্যহ ধর্মালোচনা সঙ্গীত ইত্যাদি চলতে লাগল। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক শোভা তাঁকে মুগ্ধ করে ফেলল। নৌকায় করে ঘুরতেন তিনি। কিছুদিন দ্রষ্টব্য স্থান সমূহ দেখে বারমূল্লা হয়ে মরিতে ফিরে এলেন। পুনরায় রাওয়ালপিণ্ডিতে গেলেন। এখানে হিন্দু ধর্ম বিষয়ে একটি সুন্দর বক্তৃতা দিলেন তিনি। এখান থেকে জম্মুতে কাশ্মীর মহারাজের আমন্ত্রণ পেয়ে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করলেন। জম্মুতে যে কদিন ছিলেন প্রত্যহ ঘুরে বেড়িয়েছেন। জম্মু থেকে শিয়ালকোট হয়ে ফের লাহোরে উপস্থিত হলেন। শিয়ালকোটে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছা জাগায় স্থানীয় সকলকে বললেন। সানন্দে সবাই মত দিল। বিদ্যালয়ের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হল।

লাহোরে প্রত্যহ ধর্মচর্চা চলত। গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তিনি সকলকে সম্বদ্ধ হতে আহ্বান জানালেন। এ নিয়ে হংসরাজের সঙ্গে বহু কথা কাটাকাটি হয়। এখানে একদিন একজনকে হঠাৎ স্বামীজী খুব প্রশংসা করছিলেন। লোকটি শুনে হঠাৎ বলল, কিন্তু স্বামীজী সে আপনাকে মানে না। ভাল লোক হলেই আমাকে মানতে হবে, তা কেন? স্বামীজীর উত্তরে ভদ্রলোক লজ্জা পেল। লাহোরে দিন দশের মতো কাটিয়েছিলেন তিনি। এর মধ্যে তিনটি বক্তৃতা দেন। বেদান্ত বিষয়ে তৃতীয় বক্তৃতা শুনে সকলে মোহিত হয়েছিল।

এখানে একটি সভা স্থাপনা করে তার উদ্দেশ্য স্থানীয় যুবকবৃন্দকে খুলে বললেন। গণিতের প্রফেসার তীর্থরামের সঙ্গে পরিচয় হল। পরে

তিনি রামতীর্থ স্বামী নামে বিখ্যাত হয়ে আছেন। পরবর্তীকালে ইনি আমেরিকায় গিয়ে স্বামীজীকে অনুসরণ করে বহু শিষ্য যোগাড় করেছেন। লাহোর থাকাকালীন মতবাদ প্রকাশের চেয়ে তিনি হাতে কলমে কাজের প্রতি বেশি জোর দিয়েছিলেন।

লাহোর ত্যাগের পর দেরাদুন গেলেন।

ভেবেছিলেন দেরাদুনে পূর্ণ বিশ্রাম নেবেন—কিন্তু কার্যত তা হল না। শিষ্যদের ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য শিক্ষা দান করতে লাগলেন। এখান থেকেই বাকী ভ্রমণ কাল রোজ এই অধ্যাপনা চলতে লাগল। দেরাদুনে খেতড়ির রাজা তাঁকে নিজের রাজ্যে নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করছিলেন। বিবেকানন্দ শেষ পর্যন্ত খেতড়ি চললেন। সাহারাণপুর দিল্লি আলোয়ার ও জয়পুর হয়ে খেতড়ি চললেন। আলোয়ার রাজ্যে কদিন থেকে গেলেন মহারাজের অতিথি হয়ে। প্রব্রজ্যাকালের পুরনো ভক্তদের সঙ্গে আলাপ হল। শিশুর মতো এই পুনর্মিলনে তিনি খুশি হয়ে উঠলেন।

খেতড়ির রাজা বার মাইল এগিয়ে এসে গুরুকে সমাদর করে নিয়ে চললেন। মহারাজও অল্পদিন আগে বিদেশ থেকে ফিরেছেন। খেতড়ি রাজ্যে মহোৎসব চলছে। বিবেকানন্দের সশিষ্যে পদার্পণে তা দ্বিগুণ হল। পাহাড়ের শীর্ষে মনোরম একটি বাংলোয় স্বামীজী আশ্রয় নিলেন।

কদিন পরে এখানে বেদান্তের উপর তিনি একটি দীর্ঘ সুন্দর বক্তৃতা দেন। গ্রীক ও হিন্দু সভ্যতার তুলনা করে মহা মনীষীদের কথা বলে বেদ নিয়ে আলোচনা করলেন। বললেন, সমস্ত ভাবের পেছনেই একটি মহাভাব আছে। 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' খেতড়িতে মোটামুটি বিশ্রাম পেলেন বিবেকানন্দ। খেতড়ি থেকে ফিরবার পথে জয়পুর ও যোধপুর হয়ে কলকাতা ফিরলেন। বহু জায়গা থেকে নিমন্ত্রণ এসে

ছিল, বোম্বাই, গুজরাট, বরোদা যাওয়ার ইচ্ছেও ছিল। কিন্তু যাওয়া হল না।

১৮৯৮ সালের প্রথম ভাগে বিবেকানন্দ কলকাতা ফিরলেন। মঠ আলমবাজার থেকে বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

কলকাতায় আগের মতোই কর্মসূচী মেনে চলছিলেন তিনি। নবগোপাল ঘোষ নতুন বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবেন বলে স্বামীজীকে তদুপলক্ষে যেতে বললেন। সানন্দে ব্রহ্মচারী পরিবেষ্টিত হয়ে নবগোপালবাবুর বাড়িতে পৌঁছলেন তিনি। বিগ্রহ দেখে ভাল লাগল তাঁর। প্রসন্ন চিত্তে তিনি ঠাকুরের পুজোয় বসলেন। পূজা সমাপন হলে মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের প্রণতি মন্ত্র রচনা করলেন।

'স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিনে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায়তে নম ঃ॥'

এই বছরের প্রথম দিকে মঠের জন্য বেলুড়ে জমি কেনা হল। শিবরাত্রি উপলক্ষে মঠে সকল সন্ন্যাসী মিলিত হয়েছেন। চারদিন পর ঠাকুরের তিথিপুজো। বিরাট সমারোহে আয়োজন চলছে। সমস্ত কিছু বিবেকানন্দর নির্দেশ মতো হচ্ছে। বিপুল শান্তির নেশায় মাতাল হয়ে সঙ্গীত ভজন ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে পূজার আয়োজন চলতে লাগল। তাঁর শক্তিতে উপস্থিত সমস্ত ভক্ত শিষ্য যেন শতহস্তীর বল পেয়ে আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগল।

২৯শে মার্চ ১৮৯৮ সালে একটি বিদেশী মহিলা স্বামীজীর দীক্ষা পেয়ে হিন্দুধর্মে নিবেদিত হলেন। মিস মার্গারেট নোবল্। যিনি পরে নিবেদিতা নামে সেবার বর্তিকা নিয়ে শিক্ষার শিখা হয়ে ঘরে ঘরে জ্বলে উঠলেন। ইতিপূর্বে কোনো ইউরোপীয় মহিলা হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হয় নি।

৬ই মার্চ আবার দার্জিলিং গেলেন বিবেকানন্দ চিকিৎসকের পরামর্শে। তরা মে ফিরে এলেন। তখন হঠাৎ প্লেগ রোগ মহামারী-রূপে কলকাতায় দেখা দিল। রামকৃষ্ণ মিশন থেকে আর্তের সেবার ব্যবস্থা হল। শহরের প্রতিটি কোণে কোণে এই সেবা চলতে লাগল। বিবেকানন্দ নিজে শহর পরিষ্কারে লেগে পড়লেন। তাঁর উৎসাহ অন্যকে প্রভাবিত করে তুলল। ফলে মহামারীর কবল থেকে কলকাতা জেগে উঠল। রোগ আয়ত্বে এসে গেল।

প্লেগের উপশম হলে কিছু শিষ্য শিষ্যা নিয়ে পুনরায় তিনি পার্বত্য শৈলাবাসে গমন করলেন। কাঠগোলা নৈনিতাল হয়ে অবশেষে আলমোড়ায় এলেন বিবেকানন্দ। এখানে সেভিয়ার দম্পতির আতিথ্য গ্রহণ করলেন।

এ-সময়ে পাশ্চাত্য শিষ্যদের নানা বিষয়ে উপযোগী করে তুলতে লাগলেন। নিবেদিতা ছাড়াও মিসেস ওলিবুল, জোসেফাইন ম্যাকলাউড স্বামীজীর সান্নিধ্য পাবার ও তাঁর জন্মস্থান দেখবার জন্য এদেশে এসেছিল। বিবেকানন্দ এদের অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেন—যাতে হিন্দুধর্মের নিষ্ঠা স্বভাবজ হয়ে ওঠে তার জন্য সকলকেই ভারতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। এদেশের সমস্ত কিছু সম্পর্কেই বিদেশীর মনে রেখাপাত করাবার জন্যে ইতিহাস, উপকথা জাতীয় ভাব প্রকৃতি বিষয়ে বার বার আলোচনা করতেন। ভারতীয় আদর্শ ধৈর্য সহিষ্ণুতা দয়া সেবা করুণা ক্ষমার নিদর্শন তুলে ধরলেন শিষ্যাদের চোখে।

বিদেশী এই সব শিষ্য শিষ্যাদের চোখে বিবেকানন্দ যেন নতুন ভাবে প্রকাশ হয়ে উঠলেন। আমেরিকা ও ইউরোপে যে বেদান্তর প্রচারক, প্রগাঢ় দর্শনতত্ত্ব আয়ত্বকারী পুরুষ; স্বদেশে সে আর প্রচারক নয়, কেবল সেবক। জাতির এবং মাতৃভূমির উন্নতিবিধানে স্থির সংকল্প। শুধু কথার দ্বারা অনুপ্রাণিত না করে মাতৃভূমির কাজে বিদেশীয়দের আহ্বান

করলেন। ভার দিলেন শিক্ষা ও সেবার আলোক জ্বালবার। যাতে করে হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে বিদেশীদের ভারতের প্রতি মমতা স্নেহ জন্মায়। কারণ দেশটিকে ভাল না বাসলে সেই দেশের ধর্মে আস্থা হবে কেন অন্যের। একদিন একজন শিষ্য তাঁকে বলেন, 'স্বামীজী আপনাকে কেমন করে প্রচুর সাহায্য করতে পারি?'

তার উত্তরে তিনি বলেন, 'ভারতকে ভালবাস।'

সমস্ত শিষ্য নিয়ে উত্তর ভারত পর্যটনের পথে তিনি সকলের সঙ্গে ঢের আলোচনা করেন। প্রথমে সকলে নৈনিতালে উপস্থিত হলেন। খেতড়ির মহারাজাও তখন সেখানে। একটি মুসলমান ভদ্রলোক স্বামীজীর সম্যক পরিচয় লাভ করে উৎফুল্ল হল। যোগেশ দত্ত নামে আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বিবেকানন্দর পরিচয় হয়। যোগেশবাবু যে জায়গায় স্বামীজী সম্পর্কে লিখেছেন, 'তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর হৃদয় ভারতের কথা দিয়েই পূর্ণ ছিল ভারতবর্ষ তাঁর ধ্যান, জ্ঞান। ভারতের জন্যই যেন তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত। রক্তের প্রতি বিন্দুতে এই চিন্তা ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা ছিল না।'

আলমোড়ায় দুবার আনি বেশান্তের সঙ্গে দেখা হল। উভয়ের মধ্যে নানা বিষয়ে আলোচনাও হল। সকালে উঠে সকলে প্রাতর্ভ্রমণে যেতেন। তারপর মিসেস বুলের বাসস্থানে গিয়ে গল্প হত। গল্পচ্ছলে প্রচুর উপদেশ স্নেহ হয়ে ঝরে পড়ত। কিছুদিন এই একত্র বাস করার পর তাঁর মন নির্জনতার জন্য অধীর হয়ে উঠল। তখন তিনি আলমোড়া থেকে কিছু দূরে অরণ্যের গভীরে বহু সময় কাটিয়ে তাঁবুতে ফিরতেন। পরে কিছুকাল সেভিয়ার দম্পতিকে নিয়ে আলমোড়ার বাইরে নির্জনে চলে যান। ফিরে এসে দুটি শোক সংবাদ পেলেন। পওহারী বাবার মৃত্যু, অন্য দিকে বিদেশী শিষ্য গডউইনের দেহত্যাগ। রামকৃষ্ণ পরমহংস বাদে এই পওহারী বাবাকে তিনি হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলেন তবুও গডউইনের

মৃত্যুই তাঁকে অভিভূত করে তুলল। সে প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, গডউইন ছিল আমার ডানহাত। অন্য শিষ্যরা মিলে গডউইনের জন্য একটি কবিতা রচনা করে। স্বামীজী সেই রচনাকে ভাল করতে গিয়ে নতুন একটা কবিতাই লিখে ফেললেন, 'সে শান্তিতে থাকুক।'

হৃদয়ের শোক তাঁকে আরো নির্জনাকাঙ্ক্ষী করে তুলল। এখানে আর ভাল লাগছিল না। অগত্যা কাশ্মীর চললেন তিনি। রাওয়ালপিণ্ডি মরি হয়ে শ্রীনগরে এলেন। একটি নৌকায় করে তিন চারদিন ধরে ঘুরে বেড়ালেন। বিতস্তা নদীর তীর ধরে বেড়ানো হত। কথায় কথায় নানা গল্প প্রসঙ্গে উপদেশ দিতেন স্বামীজী। একদিন এক বন্ধু সম্পর্কে গল্প বলেন। বন্ধুটি বহুদিন ধরে রোগে ভুগছিল ডাক্তার দেখিয়েও কিছু হল না। জীবনে হতাশ হয়ে পড়ল সে। এমন সময় স্বামীজীর কথা শুনে—তিনি যোগী পুরুষ জেনে তার শয্যাশিয়রে যেতে অনুরোধ্ জানাল। সেই অনুরোধ রাখলেন তিনি। বন্ধুটির রোগ শয্যায় উপস্থিত হয়ে একটি শ্রুতিবাক্য উচ্চারণ করলেন।

'ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্মবেদ ক্ষত্রং তং পরাদাদ্যোঽন্য ত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ লোকাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকাণং বেদ—' (বৃহদারণ্যক)

যিনি ভাবেন ব্রাহ্মণ থেকে তিনি ভিন্ন, তিনি ব্রাহ্মণ কর্তৃক অভিভূত হন, তেমনি ক্ষত্রিয় থেকে বিভিন্নতায় ক্ষত্রিয় কর্তৃক অভিভূত হন—সর্বোপরি এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড থেকে ভিন্নতায় ব্রহ্মাণ্ড কর্তৃক অভিভূত হন।

মন্ত্রের মতো কাজ হল। বন্ধুটি শরীরে শক্তি সঞ্চয় করে সেরে উঠল। অল্পদিনেই সুস্থ হয়ে গেল। গল্পটা বলে বললেন, 'আমি যাই করি বা বলি না কেন আমার হৃদয়ে ভালবাসা ছাড়া অন্য কিছু নাই। যেদিন বুঝব জগৎকে আমরা ভালবাসি সেদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।' শ্রীনগর

থেকে মাঝে মাঝে আশেপাশে যাওয়া হত। এখানকার মনোহর শোভন দৃশ্যে তাঁর অন্তর ভরে উঠত। পুরাণ উল্লিখিত দেবস্থান বা কোনো ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ তাঁকে আপ্লুত করে তুলত। তিনি সেই সব স্থানের মাহাত্ম্যের ও ইতিহাসের কথা শিষ্যদের কাছে বলতেন।

কাশ্মীর থেকে অমরনাথ চললেন বিবেকানন্দ। শত শত যাত্রী হাঁটা পথে তীর্থ দর্শনে চলেছে। কোথায় সাধুর দল ধুনি জ্বালিয়ে ধ্যানে মগ্ন—কেউ ধর্মালোচনা করছে, কেউ নির্বাক। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পোশাক পরিহিত বিভিন্ন তীর্থযাত্রী। ধর্মের জন্য এই ব্যাকুলতা, এই কঠিন যাত্রাই হিন্দু ধর্মের বিশেষত্ব, যা পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মীয়দের ভেতরে দেখা যায় না।

পথে ভগিনী নিবেদিতা গুরুর সহগামী হিসেবে অন্যান্য সাধুদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠলেন মধুর ব্যবহারের জন্য। চন্দনবাড়িতে বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে খোলা পায়ে একটি তুষার নদী পার হতে বললেন। চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ১৮০০০ হাজার ফুট উপরে সকলে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তবু অদম্য উৎসাহে এই বন্ধুর পথ ভেঙে তাঁরা এগিয়ে চললেন। পঞ্চতর্নীতে পৌঁছে পাঁচটি নদীর প্রতিটিতে ওই প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে স্বামীজী স্নান করলেন।

এরপর, যেন মৃত্যুর পথ। একটু এদিক ওদিক হলেই আর রক্ষে নেই। স্বামীজী পিছিয়ে পড়ছিলেন। নিবেদিতা আগে পৌঁছে অপেক্ষা করছিলেন। স্বামীজী তাঁকে যেতে বলে স্নানে গেলেন। তারপর শীতে কাঁপতে কাঁপতে গুহায় ঢুকলেন। বিরাট গুহা। আঁধারে প্রোথিত তুষার বিগ্রহ। আলগা গায়ে ছাই মেখে শুধু কৌপীন পরে দাঁড়ালেন বিবেকানন্দ। একটি প্রণত ভক্তি যেন ঈশ্বরের পদপ্রান্তে। তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলেন প্রায়। সমস্ত গুহার আবহাওয়ায় ধর্মের একটা দরজা তাঁর চোখের সামনে খুলে গেল। পরে অন্যকে বলেছেন, তিনি

স্বয়ং আমাকে দেখা দিয়েছেন। এবং ইচ্ছা মৃত্যুর বর লাভ করেছি। চতুর্দিকে নিষ্কাম ধর্মের বন্যা তাঁর অন্তর সুখে পরিপ্লাবিত করেছিল।

ফেরবার পালা শুরু হল। পহলগামে অনেক শিষ্য ছিল। সেখান থেকে শ্রীনগর ফিরলেন। আবার নৌকায় দিন কাটতে লাগল। মাঝে মাঝে নির্জনতা তাঁকে পেয়ে বসত। কাশ্মীরের মহারাজা স্বামীজীকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন। রাজ্যের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে ধর্মোপদেশ শুনে যেত। ডাল হ্রদের তীরে দুদিন বাস করে তাঁর তন্ময় ভাব যেন কেটে গিয়ে আবার কর্মের দিকে ঝোঁক এল। শিবের ঘোর নেশা যেন শক্তির কৃপায় কেটে গেল। ঘন ঘন অনুভব করলেন মা তাঁর হাত ধরে রয়েছেন। একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ মনে হল, সমস্ত পৃথিবী কোথায় উড়ে চলেছে। চেতনা নিমগ্ন মা-র ধ্যানে —অথচ শরীর আন্দোলিত হচ্ছে। এই সময়ে 'কালী দি মাদার' নামে কবিতাটি লিখে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

তিনি বলতে লাগলেন, তিনি কাল, তিনিই পরিবর্তন—অমিত শক্তির আধার। নির্ভয় প্রাণের মধ্যে তাঁর আশ্রয়—মৃত্যুর দিকে যার গতি, ত্যাগের দিকে—তার কাছেই মা রয়েছেন।

হঠাৎ কদিনের জন্য অন্তর্হিত হয়ে গেলেন তিনি। সঙ্গে কাউকে নিলেন না। কঠোর তপস্যায় দিন কাটালেন। কিছুদিন পর শ্রীনগরে ফিরলেন। কিন্তু একক থাকবার এই বাসনা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। প্রায়ই একা হয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়তেন।

কাশ্মীরের বাস উঠল। স্বামীজী কলকাতায় এলেন।

১৮৯৮ সালে ১৮ই অক্টোবর বেলুড় মঠে ফিরলেন। তাঁর শরীর ভেঙে গিয়েছিল। সেই স্বাস্থ্য নিয়েই আবার কাজ শুরু হল। নিবেদিতা বাগবাজারে শ্রীমার পদতলে হিন্দু ব্রহ্মচারিণীর মতো জীবন যাপন করতে লাগলেন। বাগবাজারে মেয়েদের জন্য একটি স্কুলও

খোলা হয়েছিল। ৯ই ডিসেম্বর মঠ স্থাপনার জন্য উৎসব হল। ভোরবেলা স্নান সেরে ঠাকুরের পাদুকা পুজো করলেন বিবেকানন্দ। মঠ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বললেন, এই মঠ উদার ভাবের কেন্দ্রস্থল হবে। সমস্ত মতবাদের সমন্বয়—তাঁর আলো একদিন জগৎ প্লাবিত করবে। পরবর্তী এপ্রিল থেকে গৃহাদি নির্মাণ আরম্ভ হয়।

শরীর উত্তরোত্তর খারাপের দিকে যাচ্ছে। হাঁপানীর টান। ডাক্তার সাবধান করে দিয়েছেন—বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। এ-সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। কথায় কথায় একদিন বলেন, 'অমরনাথে সেই যে শিব মাথায় চড়েছেন আর নামছেন না। মনটা কেমন শিবময়।' চিকিৎসার জন্য তিনি কলকাতাতেই বেশির ভাগ থাকছিলেন। কিন্তু লোকের সঙ্গে কথা বলবার বিরাম ছিল না। নিয়ম মতো খাওয়া দাওয়ার ব্যাঘাত ঘটছিল। শিষ্যরা এতে বাধা দিতে চাইলে তিনি বলেন, 'এরা আমাকে চায়—দু'টো কথা শুনতে চায়, তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারব না?' ঘুম হত না তাঁর। অনিদ্রায় ভুগছেন। ঘুমনোর জন্য একবার গ্রহণের দিন গ্রহণের মধ্যে ঘুমতে চেষ্টা করলেন। মুখে বললেন, 'গেরনের সময় কর্ম করলে শতগুণ লাভ হয়—' অতএব এই সময়ে ঘুমোলে যদি বেশি ঘুম তাঁর চোখে ভর করে।

উদ্বোধন পত্রিকা প্রকাশিত হল ত্রিগুনাতীতানন্দের সম্পাদনায়। কাগজ দেখে স্বামীজীর খুব ভাল লাগল। একটা প্রেস কেনা হল। পনের দিন অন্তর কাগজ বেরবে ঠিক হল। বিবেকানন্দ পত্রিকা সম্পর্কে নানা উপদেশ দিলেন।

পুনরায় কলকাতা থেকে বাইরে গেলেন। বৈদ্যনাথ ধামে এসে রইলেন। রোগ তখন আরো বেড়েছে। সামান্য লেখাপড়া করতেন

রোজ। প্রত্যহ বেড়াতে যেতেন। একদিন পথে একজন আমাশা রোগীকে কষ্ট পেতে দেখে তাঁর হৃদয় কেঁদে উঠল। শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে তাকে নিয়ে এলেন। সেবা যত্ন করলেন অম্লান বদনে নিষ্ঠার সঙ্গে।

সন্ন্যাসী জীবনে সেবাকে তিনি অনেক উঁচুতে স্থান দিয়েছিলেন। পরের সেবা করা, নিজের সমস্ত কার্য আপন হাতে সম্পন্ন করা সন্ন্যাসীর উচিত। গৃহস্থ লোকদের কর্তৃত্ব মঠের ব্যাপারে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। বিদেশী অনুকরণ তাঁর কাছে অসহ্য ছিল। স্বজাতি স্বদেশ স্বধর্ম যে মানুষ ভুলে যায় সে ধিক। এ সম্পর্কে ভারতবর্ষকে সম্বোধন করে বলেছেন; হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?…' ভারতবর্ষের রমনীকুল তাঁর চোখে জগন্মাতা, শক্তি-স্বরূপিনী। তাদের লক্ষ্য করে দেশকে সম্বোধন করে বলেছেন, 'হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারী জাতির আদর্শ, সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী; ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ, সর্বত্যাগী শঙ্কর—জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে বিবেকানন্দর দৃপ্ত কণ্ঠ বেজে উঠেছিল অমিত তেজে. প্রত্যেককে অন্তরে স্থান দিতে পেরেছিলেন তিনি। যাতে সকলে সেই ভাবে ভ্রাতৃভাব বজায় রাখে তার জন্যে স্বামীজী বলেছিলেন—সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। স্বদেশ সম্পর্কে সদর্পে উক্তি করেন, 'ভারত আমার যৌবনের উপবন বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ—'

এই ভাবে প্রতি বক্তৃতায় সেবা আদর্শ কল্যাণ প্রভৃতি কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে তিনি তাঁর আচরণ দ্বারা বাক্যের সত্যতার প্রমাণ রেখেছেন।

শরীর উত্তরোত্তর খারাপের দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু পরিশ্রমের যেন শেষ নেই। ডাক্তাররা তাঁকে বক্তৃতা দিতে নিষেধ করেছিলেন—কিন্তু তাতে কি হবে। মিশনের রবিবাসরীয় আসরে তিনি উপস্থিত থাকছিলেন। এ-ছাড়া ভগিনী নিবেদিতা আয়োজিত 'দি ইয়ং ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট' নামক বক্তৃতার সময় সেখানে গেলেন। শেষ পর্যন্ত বার বার বন্ধু এবং ডাক্তারদের অনুরোধে পুনরায় পাশ্চাত্য ভ্রমণে সম্মত হলেন।

যাত্রার সব ঠিকঠাক। সঙ্গে স্কুলের কাজের জন্য নিবেদিতাও যাবেন স্থির হল। সঙ্গী থাকায় সকলে নিশ্চিন্ত কিছুটা। যাবার আগের দিন মঠে সভা বসল। সকলে স্বামীজীকে বিদায় অভিনন্দন জানালেন। উত্তরে তিনি সন্ন্যাসের আদর্শ সম্পর্কে বললেন। 'সন্ন্যাসীর মৃত্যুভয় নেই। কারণ বেঁচে থাকবার বাসনা বা মোহ থেকে সে মুক্ত। তাই পরের জন্য জীবন তুচ্ছ করাই তার ব্রত। উপনিষদের বাণী উচ্চারণ করলেন।

> 'সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষি শিরোমুখং।
> সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥'

মৃত্যু ছাড়া যখন অন্য কোনো সত্য নাই, তখন মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য জীবনপাতই শ্রেয়।

১৮৯৯ সালের ২০শে জুন বিবেকানন্দের যাত্রার দিন।

শ্রীশ্রীমা কলকাতায় সকলকে খাওয়ালেন। আহারাদির পর প্রিনসেপ ঘাটে এলেন অনেকে। গোলকুণ্ডা জাহাজ প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে। যাত্রি তিনজন—নিবেদিতা, বিবেকানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ।

জাহাজে আরোহণ সময়ে সকলের মুখাবয়ব বিষাদক্লিষ্ট হয়ে গেল। একটি গম্ভীর নিনাদ পশ্চাতে রেখে জাহাজ ঢেউ ভেঙে নোঙর তুলল। ২৪শে জুন জাহাজ মাদ্রাজ পৌঁছল। চারদিন বাদে কলম্বো।

২৮শে জুন কলম্বো থেকে জাহাজ ছাড়ল ইউরোপের দিকে। পথে

এডেন সুয়েজ নেপলস্ মার্সেল হয়ে ৩১শে জুলাই লণ্ডনে পৌঁছে গেল। দীর্ঘ দেড় মাস জাহাজে কাটল। এই সময় ভগিনী নিবেদিতা গুরুর নিকট থেকে ভারতের ধর্ম দর্শন সাহিত্য প্রভৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ করলেন। একান্ত ভাবে গুরু সান্নিধ্য লাভের এই সুযোগকে সযত্নে ব্যবহার করেছিলেন নিবেদিতা। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন; এই সময়টুকু আমার জীবনে সর্বপ্রধান ঘটনা। অবসর মতো বিবেকানন্দ কিছু কিছু বাংলা প্রবন্ধ রচনা করলেন। যা সাহিত্যর ক্ষেত্রে অনবদ্য হয়ে আছে এখনও।

৩১শে জুলাই টিলবেরী ডকে নামলেন বিবেকানন্দ। তাঁর আগমন সংবাদ পেয়ে বহু শিষ্য সাক্ষাৎ করতে এলেন। স্বামীজী এবার লণ্ডনে কোনো সাধারণ সভায় বক্তৃতা করলেন না। ঘরোয়াভাবে অবশ্য অনেকের সঙ্গেই আলোচনা করেছেন। লণ্ডনে তাঁর আসবার খবর আমেরিকায় পৌঁছেছিল। তারা বার বার তাঁকে আমেরিকায় যাওয়ার জন্য ব্যাকুল অনুরোধ করে পাঠাল। দেড় মাসের মতো লণ্ডনে কাটল। তারপর আমেরিকা যাওয়ার স্থির করলেন।

১৬ই আগস্ট স্বামী তুরীয়ানন্দ ও অন্য ক'জন আমেরিকান শিষ্যের সঙ্গে তিনি লণ্ডন ত্যাগ করে আমেরিকা যাত্রা করলেন।

প্রথমে নিউইয়র্ক। এখানে মিস্টার ও মিসেস লেগেটের সঙ্গে দেখা হয়। নিউইয়র্ক থেকে ১৫০ মাইল দূরে তাদের গ্রাম বাড়িতে গিয়ে উঠলেন তিনি। হাডসন নদীর তীরে পাহাড়ের উপর স্থাপিত মনোরম স্থান। এক মাস বাদে নিবেদিতাও ইংলণ্ড থেকে এখানে এলেন। স্বামীজীর স্বাস্থ্যের কিছু পরিমাণে উন্নতি দেখা গেল। নিউইয়র্কে স্বামী অভেদানন্দ তখন প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন। খবর পেয়ে তিনিও এলেন। তাঁর কাছে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার নিমিত্ত একটি স্থায়ী মন্দির তৈরি হয়েছে শুনে স্বামীজী খুব খুশি হলেন।

৮ই নভেম্বর বিবেকানন্দ নিউইয়র্কের সাধারণের সামনে এসে দাঁড়ালেন। স্বামী অভেদানন্দ ও তুরীয়ানন্দ ইতোমধ্যেই চতুর্দিকে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন। বেদান্ত সমিতি তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানাল। দু সপ্তাহ নিউইয়র্কে কাটল। মাঝে-মাঝে কাছাকাছি শহর সমূহতেও তিনি যাচ্ছিলেন। অতঃপর ক্যালিফোর্নিয়ায় চললেন। পথে সিকাগোয় নামলেন। পুরণো বহু পরিচিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। ক'দিন তাঁদের মধ্যে পরিতৃপ্ত হয়ে কাটালেন।

লস এঞ্জেলেসে মিসেস ব্লজেটের অতিথি হলেন। পুরোদমে ধর্ম-চর্চা শুরু হল। একের পর এক তত্ত্বালোচনা। আবার আগের মতো চারপাশ থেকে তাঁর বাণী শোনবার জন্য সাড়া পড়ে গেল।

পরপর তিনি অনেকগুলো বক্তৃতা করলেন। সেই সব বক্তৃতা শুনে মনে হয়েছিল তিনি পূর্ব ক্ষমতা ফিরে পেয়েছেন। ক্যালিফোর্নিয়ায় তাঁর কণ্ঠ নতুন করে বহু আমেরিকানকে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণে আগ্রহী করে তুলল। ক্যালিফোর্নিয়ার কাগজে কাগজে বক্তৃতার সারাংশ ছবি ও নাম ছাপা হতে লাগল। 'হিন্দু মতে মুক্তির পথ' শীর্ষক ভাষণ শুনে ওকল্যাণ্ডের রেভারেণ্ড ডাক্তার বেঞ্জামিন মিলস উচ্ছসিত হয়ে বলেন, 'ইনি একজন অসাধারণ প্রতিভাধর—এর শক্তির কাছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণও ছেলে মানুষ।'

মে মাস পর্যন্ত স্যানফ্রানসিসকোতে কাটল।

প্রতি রবিবার এখানে ভাষণ দিয়ে চললেন। বিষয় নানাবিধ। কখনো ধর্ম ও দর্শন, কখনো বা যুগপুরুষ কৃষ্ণ, খ্রীস্ট, মহম্মদ, কোনো কোনো সময় ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগের উপরে।

এখানে প্রাণায়াম সম্পর্কে একবার বলেন, শ্বাস জয় হলেই চিত্ত জয় হবে। এ প্রসঙ্গে একটি গল্প বলেছেন পরে। একদিন নদীর ধারে তিনি বেড়াচ্ছেন। কজন যুবক নদীতে ভাসমান ডিমের খোলা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছিল। কিন্তু কেউ লক্ষ্যভেদে সমর্থ হল না। তাই দেখে তিনি হাসতে যুবকরা রেগে গিয়ে বলল, 'আপনি যত সহজ ভেবে হাসছেন, কাজটা তত সহজ নয়—এদিকে এসে একবার বন্দুক হাতে নিয়ে দেখুন।' বিবেকানন্দ নীরবে বন্দুক নিলেন। পর পর বারো বার লক্ষ্যভেদ করলেন। সকলে ভাবল গুলিচালনা তাঁর বহুদিনের অভ্যাস। বিবেকানন্দকে তারা জিজ্ঞেস করল এ বিষয়ে। তিনি উত্তর দিলেন, 'জীবনে এর আগে বন্দুক হাতে নেন নি। আসল ব্যাপার হচ্ছে মনসংযোগ।' তাঁর মনসংযোগের পরিচয় পেয়ে সকলে অবাক হয়ে গেল।

ক্যালিফোর্নিয়ায় বেদান্তর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল। স্থানে স্থানে

মঠ সমিতি স্থাপিত হল। বহু যুবক উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রচারব্রতে ব্রতী হল। ১৯০০ সালের বসন্তে কিছুদিন বিশ্রামের জন্য আবার গ্রামে চলে গেলেন। ক্যাম্পটেল গ্রামে তিন সপ্তাহ কাটিয়ে ফের সানফ্রান্সিসকোতে ফিরে এলেন। শরীর খারাপ হয়ে পড়ায় ভাষণ দেওয়া চিকিৎসকের নির্দেশে বন্ধ থাকল। লণ্ডন থেকে লেগেট দম্পতী চিঠি দিলেন। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য প্যারীতে আসতে অনুরোধ করলেন। প্যারীতে তখন বিরাট এক প্রদর্শনীর আয়োজন চলছে। একটি ধর্মসভা হবে এ-রকম স্থির ছিল।

মে মাসের শেষে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে বিদায় নিলেন। ফিরতি পথে কদিন সিকাগো ও ডেট্রয়টে থাকলেন। তারপর আবার নিউইয়র্ক। বেদান্ত সোসাইটির প্রধান কার্যালয়ে পর পর চার রবিবার বক্তৃতা করলেন। প্রতি শনিবার গীতার ব্যাখ্যায় কাটল। তারপর অন্যান্য গুরুভাই ও শিষ্যদের উপর আপন কার্যভার তুলে দিয়ে আমেরিকা থেকে বিদায় নিলেন। শেষ সময়ে বললেন, 'যাও ভাই বেদান্তের ধ্বজা উড়াও। মা জগদম্বা তোমাদের সহায়।'

২২শে জুলাই বিবেকানন্দ প্যারী অভিমুখে রওয়ানা হলেন।

মিস্টার ও মিসেস লেগেটের আতিথ্য নিলেন বিবেকানন্দ। এখানে প্রচুর নামকরা ব্যক্তিরা আসতেন। কবি দার্শনিক বৈজ্ঞানিক শিল্পীর সমাগমে লেগেট-গৃহ মুখরিত হয়ে থাকত। স্বামীজী এই সকল দিকপালদের সঙ্গে অবাধ আলোচনার মেলামেশার সুযোগ পেলেন। এবং প্রতি বিষয়ে তাঁর পারদর্শিতা দেখিয়ে সকলকে চমৎকৃত করলেন। ফরাসী ভাষা বিবেকানন্দ জানতেন না। ধর্মসভায় বক্তৃতা দেবার দিন ঘনিয়ে আসছিল। দুমাস আগে থেকে ফরাসী ভাষায় আলোচনা

করছিলেন। দেখতে দেখতে দর্শন ও ধর্মের জটিল তত্ত্বসমূহ ফরাসী ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ্য আয়ত্ব করে ফেললেন। ফলে সকলকে সহজে তাঁর ভাব মনের কথা বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা বেড়ে গেল।

প্রথম দিন কংগ্রেসে উপস্থিত হলেন বিবেকানন্দ। মিস্টার গস্টাভ অর্পট নামে এক জার্মান প্রাচ্য বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত একটি হিন্দুধর্মের উপর প্রবন্ধ পড়ছিলেন। বিষয় শিবলিঙ্গ পুরুষ জননেন্দ্রিয়ের চিহ্ন—শালগ্রাম শিলা যোনি স্বরূপ। যোনি ও লিঙ্গের আরাধনা থেকেই কালক্রমে এই প্রতীক পূজার শুরু হয়েছে। স্বামীজী প্রতিবাদ করলেন, বেদ থেকে প্রমাণ তুলে যুক্তি তর্কের দ্বারা বোঝালেন এই ধারণা ভুল। প্রকৃত খ্রীস্টান ধর্মের পবিত্র ভোজন উৎসবের নরমাংস খাওয়ার কথার সঙ্গে তার যেমন সম্বন্ধ, শিবলিঙ্গ ও শালগ্রামশিলার সঙ্গে লিঙ্গ যোনি পূজার সম্বন্ধও ততটুকু।

দ্বিতীয় বক্তৃতাদানকালে তিনি বললেন: বেদই হিন্দুধর্ম, ভারতে উদ্ভূত অন্য সকল ধর্মের ভিত্তিভূমি। স্বামীজীর বক্তৃতা সকলকে অভিভূত করে। সভাস্থ সকলে তাঁর যুক্তি, বক্তব্যের সত্যতা মেনে নিতে বাধ্য হয়। বৃদ্ধ সভাপতিও সমালোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্যারীতে থাকাকালীন ফরাসী সভ্যতা তাঁর হৃদয়ে আলোড়ন তোলে। প্যারী সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন: প্যারী এক মহাসমুদ্র—এই নগরী ইউরোপীয় সভ্যতা গঙ্গার গোমুখ। মর্ত্যের অমরাবতী, সকল জায়গায় এদের নকল।

ফরাসীদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা সর্ব বিষয়ে তারা ইউরোপীয় নব জাগরণের পথ প্রদর্শক।

সভা শেষ হলে বিবেকানন্দ মিসেস ওলিবুলের আমন্ত্রণ পেয়ে বৃটানি প্রদেশস্থিত লানিয়ঁয় গিয়ে কিছুদিন রইলেন। নিবেদিতাও আমেরিকা থেকে এখানে এসেছিলেন। বিশ্রাম পেলেন কদিন। বুদ্ধদেবের জীবন

কাহিনীর ওপর নানা কথা বললেন এসময়ে। বুদ্ধদেবের প্রতি বিবেকানন্দর এই শ্রদ্ধার মূল কারণ তার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাদৃশ্য। বিবেকানন্দ লানিয়ঁর ত্যাগ করবার আগেই নিবেদিতা ইংলণ্ড ফিরে গেলেন। বিদায়কালান আশীর্বাদপ্রার্থিনী শিষ্যাকে তিনি বললেন, যদি আমি তোমায় তৈরি করে থাকি তবে তোমার বিনাশ ঘটুক। আর যদি জগন্মাতা তোমাকে গড়ে থাকেন তবে চির আয়ুষ্মতী হও।

বৃটানি থেকে প্যারীতে ফিরে বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সান্নিধ্যলাভ ঘটল। তিনি তাদের কাছে ভারতের কথা হিন্দুধর্মের কথা বারংবার বলতেন। নানা বিষয়ে পারদর্শী বিভিন্ন নরনারীর সঙ্গে তিনি মিলিত হলেন। প্যারী থেকে বিদায় নেবার আগে এখানকার মেলায় ভারতবাসীর বিশেষ করে বাঙালীর দৈন্যতা লক্ষ্য করে লিখেছিলেন: …কাল সন্ধ্যেয় প্যারী থেকে বিদায়। এ বছর প্যারী সভ্য জগতের এক কেন্দ্রস্বরূপ। চারদিক থেকে নিজের দেশের শ্রেষ্ঠতা নিয়ে মানুষ এসেছে। অথচ এই মহামিলন কেন্দ্রে বাংলা তুমি কই? কে তোমার নাম নেয়? সমবেত সেই প্রতিভামণ্ডলীর মধ্য থেকে বীর বঙ্গভূমির একটি সন্তান তবু মাতৃনাম উচ্চারণ করলেন—তিনি জগদীশচন্দ্র বসু। আপন প্রতিভা দিয়ে মুগ্ধ করলেন বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীকে। ধন্য বীর তিনি।

তিন মাস ফ্রান্সে কাটিয়ে বিদায় নিলেন স্বামীজী। ভিয়েনায় গেলেন প্রথমে। তিন দিন থাকলেন। ভিয়েনার পর একে একে হাঙ্গেরী সার্ভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া হয়ে কনস্টান্টিনোপল এলেন। কনস্টান্টি-নোপল থেকে স্টিমারে করে এথেন্স গেলেন। এথেন্সে ঘুরে ঘুরে নানা দর্শনীয় স্থান দেখলেন তিনি। ধর্মীয় ধ্বংসাবশেষ ইতিহাস উল্লিখিত স্থান প্রভৃতি চারদিন থেকে দেখলেন। এথেন্স থেকে মিসর গেলেন। মিসরের পিরামিড অন্যান্য ফ্যারাও সম্রাটদের স্মৃতি দেখে বিশেষ ভাল লাগল না। তাড়াতাড়ি দেশে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন।

এ সময় ভারতে তার প্রিয় শিষ্য সেভিয়ার মারা গেলেন। প্রথম যে স্টিমার পাওয়া গেল তাতেই তিনি ভারত যাত্রা করলেন। স্টিমার বোম্বাই পৌঁছতে তিনি আনন্দে অধীর হয়ে পড়লেন। তাঁর আসবার খবর কেউ জানত না।

৯ই ডিসেম্বর রাত্রে স্বামীজী বেলুড় মঠে পৌঁছলেন। সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা সকলে খাচ্ছিল। এমন সময় বাগানের মালী ছুটে এসে বলল, 'একজন সাহেব এসেছে।' সাহেব, কিজন্য এসেছে, কোথা থেকে …সকলে কেবল এইসব ভাবছে—এমন সময় তারা দেখল সাহেব সামনে এগিয়ে আসছে। সাহেবকে চিনতে পেরেই সকলে চিৎকার করে উঠল আনন্দে, স্বামীজী এসেছেন।

একটা হৈ-হুল্লোড়ের বন্যা বয়ে গেল। সমস্ত রাত মঠের কারো ঘুম হল না। প্রথমে সবাই ভাবল চোখের ভুল নয় তো—কি করে উনি এলেন। চাবির জন্য মালী এসেছিল অথচ…পাঁচিল টপকে আসলে বিবেকানন্দ ঢুকে পড়েন। বললেন, শুনলাম তোমরা খাচ্ছ, দেরী হয়ে গেলে যদি সব সাবাড় হয়ে যায়—তাই পাঁচিল টপকালুম।

খিচুড়ি প্রসাদ খেলেন পাত বিছিয়ে। অনেক দিন খান নি, মুখে অমৃতের স্বাদ লাগল। তারপর সারা রাত ধরে গল্প চলল।

দ্বিতীয়বার বিদেশ প্রত্যাগত হয়ে বললেন: প্রথমবার যখন ওদেশে গেছি, তখন ওদেশের দল বেঁধে কাজ করবার ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হয়েছি। ভাল লেগেছিল এই কর্ম প্রণালী। কিন্তু এবার গিয়ে দেখলাম আসলে ওদের ব্যবসা প্রবৃত্তিটাই মুখ্য—অর্থলোভ স্বার্থপরতা আত্মক্ষমতা লাভের চেষ্টা সকলের মধ্যে প্রধান। যত বেশি দেখলুম, তত বুঝলাম, দেশটা নরক।

ভারতবর্ষে ফিরেই আবার তিনি কর্মে আত্মনিয়োগ করলেন। জীর্ণ স্বাস্থ্য ভগ্নদেহ—তবু কর্তব্য তার পথবর্তিকা। মিশনের কাজে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে উৎসর্গ করলেন। প্রথমেই মৃত সেভিয়ার-এর স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মায়াবতী যাবেন স্থির করলেন।

বিবেকানন্দ টেলিগ্রাম করে জানালেন, ২৭ তারিখ কলকাতা থেকে রওনা দিয়ে ২৯ তারিখ কাঠগোদামে পৌঁছবেন। কাঠগোদাম থেকে মায়াবতী ৬৫ মাইল। ২৫ তারিখে টেলিগ্রাম পৌঁছনোয় কুলি যোগাড় করা সম্ভব হল না। এমনিই পাহাড়ের রাস্তা এ সময় খুব খারাপ। তারপর এ বছর অত্যধিক শীত। প্রথম দিন সন্ধ্যায় ঢারি পৌঁছনো গেল। রাত কাটল ডাকবাংলোয়। পরদিন সকাল থেকে বৃষ্টি। বরফ পড়বার উপক্রম।

বেরোতে বেরোতে বেলা অনেক হয়ে গেল। পনের মাইলের মধ্যে দাঁড়ানোর জায়গা নেই। যে ভয় এবং ভাবনা ছিল শেষ পর্যন্ত তাই হল। বেগে বৃষ্টিপাতের সঙ্গে বরফ পড়ছে। বিবেকানন্দর কিন্তু ভ্রূক্ষেপও নেই। তিনি যেন মজা পেয়েছেন। ডাণ্ডিবাহকদের পা পিছলে যাচ্ছে। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। বিকেল পড়ে এল। অন্ধকার আর বরফে সমাহিত পরিবেশ। স্বামীজী সকলকে বকতে লাগলেন। পথিমধ্যে ছোট্ট অপরিসর একটি দোকান ঘরে রাত কাটল। পরদিন ভোরবেলা বার ইঞ্চি বরফ ভেঙে শুরু হল যাত্রা। শেষ পর্যন্ত সকলে মায়াবতী পৌঁছলেন।

মায়াবতীতে থাকাকালীন প্রত্যহ বরফ পড়ায় স্বামীজী তেমন ঘুরতে পারেন নি। স্থানীয় আশ্রমবাসীরা যদিও তাঁকে তাদের মধ্যে পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তিনি এখানে আবার পূর্ণতেজে বক্তৃতা করতে লাগলেন। একদিন বললেন, যার মধ্যে খাঁটি প্রেম ও ভালবাসা আছে সকলে তাকে শ্রদ্ধা করেন। হিমালয় পর্বতের কোলে শান্ত নির্জন এই

আশ্রমে খুব সুখে ছিলেন তিনি। মিসেস সেভিয়ার সঙ্গে মাতৃস্থানীয়ার ন্যায় ব্যবহার করতেন। নিজে যেন ছোট্ট একটি শিশু। আশ্রমের নিকটে ধরমঘর নামে জায়গাটুকু বেশ উঁচু। সবাইকে সঙ্গে করে একদিন বেরিয়ে এলেন। হ্রদের পাশে নিরিবিলি রাস্তা। মিসেস সেভিয়ারকে বলেছিলেন, জীবনের শেষে সব কাজ ছেড়ে এখানে আসব। তখন শুধু লিখব আর গান গাইব। এখানে এসেও নিশ্চিন্তে ছিলেন না তিনি। প্রবন্ধ লিখে ফেললেন। চিঠিপত্র লিখতেনই।

প্রচণ্ড শীত আর চারদিকে বরফ। অথচ বিবেকানন্দ ফিরবার জন্য ব্যস্ত। কুলি পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরবেন ঠিক হল। পিলিভিত থেকে ট্রেন ধরবেন। ট্রেনে ওঠবার সময় একটা ঘটনা ঘটে। দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় স্বামীজী ও তাঁর সঙ্গী সদানন্দকে একজন ইংরেজ কর্নেল উঠতে দেবে না। স্টেশন মাস্টারের কাছে গিয়ে সে বলল। স্টেশন মাস্টার এসে অন্য কামরায় স্বামীজীকে যেতে অনুরোধ করায় তিনি অসম্ভব রেগে গিয়ে বললেন, আমাকে একথা বলতে লজ্জা করে না। স্টেশন মাস্টার তাড়াতাড়ি পালাল। কর্নেল কামরায় ফিরে এসে স্বামীজীকে দেখে এবার স্টেশন মাস্টার, স্টেশন মাস্টার বলে চিৎকার করতে লাগল। সাহেব ক্ষেপে গেল। উপায়ান্তর না দেখে শেষ পর্যন্ত নিজেই অন্য কামরায় সরে পড়ল।

২৪শে জানুয়ারী ১৯০১, স্বামীজী বেলুড় মঠে প্রত্যাগমন করলেন। দেড় মাস মঠে কাটল। শরীর কিছুতেই ভাল হচ্ছে না। হাওয়া বদলালে যদি উন্নতি হয় তাই ভাবছিলেন। এমন সময় ঢাকা থেকে আহ্বান এল। বিবেকানন্দ রাজী হলেন ঢাকা যেতে।

মার্চ মাসে ঢাকা রওয়ানা হলেন ক'জন শিষ্য নিয়ে। স্টেশনে প্রচুর জনসমাগম হয়। সকলে জয়তু ধ্বনিতে দিক মুখরিত করে তুলল।

ঢাকায় যে কদিন ছিলেন প্রচুর লোক তাঁকে দেখতে আসত। বিকেলের অবসর শাস্ত্রচর্চা প্রভৃতিতে কাটত। আধ্যাত্মিক আলোচনায় সময় পার হয়ে যেত। জগন্নাথ কলেজ পগোজ স্কুলের উন্মুক্ত মাঠে দুটি বক্তৃতা দিলেন। ঢাকাবাসী মুগ্ধ হয়ে সেই উদাত্ত কণ্ঠের অমৃতবাণী শ্রবণ করল। ইউরোপে তাঁর শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার বিষয় বর্ণনা করলেন। পৌত্তলিকতার দোহাই দিয়ে যাঁরা হিন্দুধর্মের প্রতি বিরূপ তাদের ধারণা ভুল প্রমাণ করলেন। পৌত্তলিকতাই ধর্মের সবটুকু নহে। পুজোর বাইরে, সমারোহের ঊর্ধ্বে যে শান্তি তাই আমার কাম্য। ঈশ্বর আমার একান্ত অন্বেষণ। প্রাচীন পন্থীদের মতো সেই অন্বিষ্ট মুক্তিই আমার কাম্য। যাদের কাছ থেকে আমি পাঠ নিয়েছি :

'দুর্লভ ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকং।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষ সংশ্রয় ॥'

প্রথম চাই মনুষত্ব। তারপর মোক্ষ এবং সকল সুখ-দুঃখের অতীত প্রদেশে যাবার আগ্রহ। অবশেষে গুরুর কৃপা। যিনি আলো দেখাবেন। মহাপুরুষ দর্শিত সেই আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে অভ্যাসের দ্বারা স্বীয়চেতনাকে উন্নীত করা। এ না করতে পারলে কিছুই হবে না।

একদিন এক বেশ্যা তাঁকে দেখতে এল। সমস্ত শরীর গয়না দিয়ে মোড়া। খবর পেয়েই স্বামীজী তাকে ভেতরে ডাকলেন। বেশ্যা ভেতরে গেল। প্রথমেই বলল, সে হাঁপানীতে ভুগছে। ওষুধ দিতে হবে। ওষুধ নিতেই এসেছে। স্বামীজী সহানুভূতিভরা কণ্ঠে বললেন, এই দেখ মা আমিও ভুগছি। ওষুধ জানলে আমার কি এ-রকম হত! তাঁর এই করুণ কথায় আশীর্বাদ নিয়ে বেশ্যাটি চলে যায়।

ঢাকা থেকে কামাখ্যার তীর্থ দেখতে গেলেন।

ঢাকা ও কামাখ্যায় শরীর আরো খারাপ হয়ে পড়ল। ঠিক হল

শিলং যাবেন। স্বাস্থ্যকর স্থান শিলং। কিন্তু শিলং-এও শরীর সারল না। বরং আরো খারাপ হয়ে উঠল। এদিকে এত যন্ত্রণা তা সত্ত্বেও তিনি ঈশ্বরকে চিন্তা করতেন। আপন মনে কথা বলতেন। একদিন শিষ্যরা শুনল, তিনি বলছেন, 'যাক মৃত্যুতে কি আসে যায়? যা দিয়ে গেলুম দেড় হাজার বছরের খোরাক।'

কিছুদিন বাদে তিনি বেলুড় মঠে ফিরে গেলেন। মঠে পূর্ববঙ্গের অবতার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা গল্প হত। একদিন কথা চলছিল। ওখানে ঘরে ঘরে অবতার। একটি বাচ্চা ছেলে প্রায়ই একটা ফটো দেখিয়ে বলত বলুন তো ইনি অবতার কিনা। তাকে জানি না বলে হাঁটালেও সে আসত। আর মুখে ওই এক প্রশ্ন। শেষে বাধ্য হয়ে তাকে বললেন, 'বাবা একটু ভাল খাবার খেও—তোমার ঘিলু যে একেবারে গেছে।' কথাটা বলে বললেন, 'এ কথায় ছেলেটির বোধ হয় রাগ হয়েছিল। কিন্তু আমার উপায় কি?'

শরীর দিন দিন অবনতির দিকে ধাবিত।

## ১০

পূর্ববঙ্গ ও আসাম ঘুরে এসে রোগের প্রকোপ যেন আরও বাড়ল। সমস্ত গুরু ভাইরা তাঁকে পূর্ণ বিশ্রাম দেবার জন্যে কোনো কাজ করতে দিতেন না। সাত মাস চুপচাপ কাটালেন বিবেকানন্দ। যা তাঁর কাছে তাঁর মতো গতিশীল চরিত্রের কাছে অসহ্য। কারণ চুপ করে থাকলেও মন গভীরে চলে যায় আপনা থেকে। এমন ভাবে চিন্তায় ডুব দিয়ে বাহ্যজগৎ তিনি ভুলে যেতেন। সময় সময় কোনো কথাই মনে থাকে না। কিন্তু শিক্ষা দেওয়ার সময়ে কিন্তু এমনটি হত না।

ভারতবর্ষের নানা স্থানের বিভিন্ন লোক তাঁর কাছে মঠে ছুটে আসত। তাদের সাদরে গ্রহণ করতেন তিনি। কথা বলতেন। একটানা দীর্ঘ রোগ তাঁকে কাবু করলেও মনের তেজ কোথাও ম্লান হতে দেননি। উপরন্তু এই সময় তাঁর দৃষ্টি অনেক সূক্ষ্ম ও অন্তর্চেতনা অনেক তীক্ষ্ণতা পেয়েছিল। একটু সুস্থ বোধ করলেই কাজ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। যদিও তাকে কোনো গুরুতর কাজ কেউই করতে দিতনা।

বিবেকানন্দের এ সময়ের দিন তালিকা এই রকম। সকালে শয্যা ত্যাগ করতেন। এ তাঁর বহুদিনের অভ্যাস। তারপর তপস্যা ধ্যান ইত্যাদির পর গরুর সেবা ও ঘুরে ঘুরে বাগান দেখা। স্বামীজীর পালিত বহু পশুপাখি মঠে ছিল। হাঁস সারস কুকুর হরিণ ছাগল। ছাগলের

দুধ দিয়েই সকালে চা খেতেন। পোষ্যদের সঙ্গে খেলা করে বহু সময় কাটাতেন। তাঁর নাম শুনে নতুন বহু আগন্তুক হঠাৎ এসে তাঁকে এ অবস্থায় দেখে ভাবতেন ইনিই বিশ্ববিজয়ী বেদান্তবিদ বিবেকানন্দ! পশুপাখিদের থাকবার জায়গা নিজে দেখতেন। তাদের খাদ্যের বন্দোবস্ত করতেন। মানুষের মতো কথা বলতেন মনোযোগ দিয়ে।

মঠের এই দিনগুলোয় তিনি সমাজের ধার ধারতেন না। যখন যা ইচ্ছে করতেন। পূর্ববঙ্গ ও আসাম থেকে ফিরতে আরেকটি রোগ দেখা দিল তাঁর—শোথ, পা ফুলে উঠল। তাতেও তাঁর মনে কিছু মাত্র দুর্বলতা প্রকাশ পেল না। সদা প্রফুল্ল ও হাস্যপ্রিয় হয়ে রসিকতা নিয়ে মেতে থাকতেন। মা যা করবেন তাই হবে সুতরাং দুঃখ করে কি লাভ। বাইরের লোকের সঙ্গে কথার সময়ে এমন ভাবে কথা বলতেন মনে হত কোনো রোগ তাঁর নেই। একদিন শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী তাঁকে এসে জিজ্ঞাসা করেন, কেমন আছেন?

স্বামীজী উত্তর দিলেন, আর বাবা থাকা থাকি কি। দেহ দিন দিন অচল হচ্ছে। শরৎ মহারাজ বললেন, আপনি একটু বিশ্রাম নিয়ে থাকুন, দেখবেন কেমন সুন্দর সেরে উঠেছেন।

স্বামীজী পুনরায় উত্তরে বললেন: 'তার যো নেই—ঐ যে ঠাকুর যাকে কালী কালী ডাকতেন, তিনি মরবার দুদিন আগে সেইটে এই শরীরে ঢুকে গেছে, স্থির হয়ে থাকতে দেয় না—তাড়া করে নিয়ে বেড়ায়।'

১৯০১ সালের জুন পর্যন্ত এক ভাবে কাটল। সকলেই তাঁর ভাল করে চিকিৎসা করবার কথা ভাবছিলেন। কবিরাজী চিকিৎসা চলল দুমাস। কিছুটা সুস্থ হলেন তিনি। কোনো কাজ করতেন না তখনো। যদিও অধ্যয়ন থেকে বিরত থাকতে পারেন নি। তিনি যে কি ভীষণ পড়তেন তা একটি ঘটনায় প্রমাণিত। অমন অসুস্থ শরীর। মঠের জন্য

এক সেট এনসাইক্লোপিডিয়া বিট্রানিকা কেনা হয়েছে। একদিন এক শিষ্য ঝকঝকে বইগুলো দেখে বললেন এক জীবনে এ পড়া সম্ভব না। স্বামীজী ইতোমধ্যেই দশটি খণ্ড পড়ে ফেলেছেন। শিষ্যের কথা শুনে বললেন, সে কি তুই প্রথম দশখানা থেকে আমায় যে কোনো প্রশ্ন কর—সব বলে দেব।

শিষ্য তো অবাক। 'আপনি বইগুলো পড়ে ফেলেছেন!'

'না পড়লে আর কি বলছি।'

এইভাবে পড়া মানুষের সাধ্যাতীত। অথচ স্বামীজী অনায়াসে সারাজীবন এমনি অজস্র অধ্যয়ন করেছেন। সে বছর বিবেকানন্দর ইচ্ছেয় মঠে দুর্গাপূজার আয়োজন হল। রীতিমতো প্রতিমা বসিয়ে পুজো। এক গুরু ভাই স্বপ্নে দেখেছেন—মা দশভুজা গঙ্গা পেরিয়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে মঠে আসছেন। স্বামীজীর ইচ্ছে শুনে তিনি স্বপ্নের কথা বললেন। সঙ্গে সঙ্গে সব ঠিক হয়ে গেল। শ্রীমার অনুমতি চেয়ে পাঠানো হল। মঠে ধুমধাম লেগে গেল।

সারদামণি এলেন। বোধন থেকে একটা খুশির বন্যা প্রবাহিত হল। হৈ-হৈ-র মধ্য দিয়ে পূজা সমাপ্ত হল। এই পুজোর পর বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীলক্ষ্মী ও কালী পুজোর বন্দোবস্তও করলেন। একদিন মা-র সঙ্গে কালীঘাটে গেলেন। মা-র মানত ছিল। মানত রক্ষা করে বিবেকানন্দ জননী কালীর পুজো দিলেন। জীবনের শেষ সময়ে স্বামীজী এই সব পুজো আচ্ছার মধ্য দিয়ে ক্রমে হিন্দু দেবদেবীর প্রতি আন্তরিক হয়ে উঠলেন। কারণ যদিও বেদান্তে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস, তথাপি একবার তিনি বলেছেন, 'শাস্ত্র মর্যাদা নষ্ট করতে আমি আসি নি। বরং তা পূর্ণ করতে এসেছি।'

অক্টোবরের পর থেকে অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ল।

স্বামীজীর বেরনোর ক্ষমতা লুপ্ত হল। বিদেশী ডাক্তার স্যাণ্ডার্স

দেখলেন। শারীরীক মানসিক সব রকম পরিশ্রম থেকে সরে থাকতে হবে। সকলে সতর্ক হয়ে ডাক্তারের নির্দেশ পালনে ব্রতী হল। ক্রমে তিনি কিছুদিন পর সামান্য সুস্থ হলেন। আস্তে আস্তে বাইরে বেরোবার ক্ষমতা পেলেন। কিন্তু তিনি যেন বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর যৌবনের তেজ স্তিমিত হয়ে গেছে। আর সে দীপ্ততা নেই। অথচ এখনও এদেশের প্রতি কত কাজ বাকী! এই চিন্তায় তাঁকে হতাশ করে তুলত।

১৯০১ সালের শেষাশেষি জাপান থেকে দু-ব্যক্তি বেলুড়ে এল। একজন বৌদ্ধ মঠের অধ্যক্ষ—নাম ওডা। তার সঙ্গী ওকাকুরা। স্বামীজীকে জাপান ভ্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলেন তারা। জাপানে শিগাগরই একটি ধর্ম মহাসভার আয়োজন চলছে। জাপানে ধর্ম জাগরণ বিশেষ দরকার। এবং সেই জাগরণকে সূচিত করতে পারেন একমাত্র বিবেকানন্দ, তাই তারা তাঁর কাছে এসেছেন। অতএব তিনি চলুন।

আপন রোগ, ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি সমস্ত ভুলে তিনি সম্মত হয়ে গেলেন।

স্বামীজী জাপানী অতিথিদ্বয়কে সমাদর করলেন। তাঁদের সঙ্গে বুদ্ধ গয়ায় গেলেন। কদিন থাকলেন। তারপর সেখান থেকে কাশী। কাশী থেকে জাপানী ভদ্রলোক ওকাকুরা বিদায় নিলেন। কাশীতেই কিছুদিন থেকে গেলেন তিনি। এখানকার কিছু বাঙালী ছেলেদের একত্র করে একটি সেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য উপদেশ দিলেন। ফলে কাশীতে 'রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে'র প্রতিষ্ঠা হল। সেই ছোট প্রতিষ্ঠান কালক্রমে ভারতের সব জায়গায় পরিচিত হয়ে উঠল। কাশীতে খুব আনন্দের মধ্যে থেকে স্বামীজী বেলুড় মঠে ফিরে এলেন। ওখানে শারীরীক সুস্থই ছিলেন। কিন্তু মঠে ফিরতেই রোগ আবার

বেড়ে গেল। বিছানায় পড়লেন। পা ফুলেছে, শরীরে জল জমেছে নিরানন্দে ঠাকুরের জন্মোৎসব পালিত হল। কারো মনে সুখ নেই। সকলের চোখে কান্না থমকে রয়েছে। স্বামীজী তাঁদের অন্তর যেন স্পর্শ করে আছেন বেদনা নিয়ে বিশেষ করে পাহারায় রত নিরঞ্জনানন্দকে দেখে একদিন তাঁকে ডেকে বললেন, 'এত ভাবছিস কি? শরীরটা জন্মেছে আবার মরে যাবে। তোদের ভেতরে যদি আমার ভাবটা ঢোকাতে পারি, তবেই জানবি দেহ ধরা সার্থক। সর্বদা মনে রাখবি মূলমন্ত্র ত্যাগ।'

শরৎ চক্রবর্তী বুঝতে পারছিলেন সময় খুব কাছে এসে পড়েছে। একদিন তাই তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'এবার আমায় উদ্ধার করতেই হবে।'

তার উত্তরে স্নেহভরা কণ্ঠে বিবেকানন্দ বললেন, 'কে কার উদ্ধার করতে পারে বল?' গুরু শুধু অন্ধকার ঘুচিয়ে দিতে পারে। তখন আলোর সামনে আত্মা প্রকাশিত হয়ে আপনি জ্বলে ওঠে।

নিবেদিতা ফিরে এসেছিলেন। একদিন কিছু শ্বেতাঙ্গ মহিলা নিয়ে দেখা করে গেলেন।

১৯০২ সালের প্রথম ভাগ এমন উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটল।

এখন থেকে হঠাৎ যেন বিবেকানন্দ শরীরকে তুচ্ছ করে ইচ্ছে মতন কাজ করে যেতেন। সকলের সঙ্গে মিশে গান করতেন, হাসি-তামাসা চলত। সকলে এই পরিবর্তন দেখে মনে মনে ভাবছিল স্বামীজী ভাল হয়ে গেছেন। আসলে সকলের উদ্বেগকে দূর করবার জন্যই এরকম করছেন। তাঁর কষ্ট হবে বলে বহুলোককে শিষ্যরা দেখা করতে দিত না। তাই দেখে একদিন তিনি বললেন, এ দেহ গেলেই বা কি আসে যায়— দেহ তুচ্ছ, দেশের লোকের হৃদয়নিহিত আত্মাকে মুক্তির আলোক দেখাবার জন্য আমি শত শত বার মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করতে রাজী আছি।

দেশপ্রেম না থাকলে এমন কথা কেউ বলতে পারতেন না।

শিষ্যদের সর্ব বিষয়ে শক্তিশালী করে তুলতে মনোযোগী হলেন তিনি। উপদেশ দিয়ে, উদাহরণ দিয়ে ত্যাগের বর্তিকা জ্বালতেন তাদের হৃদয়ে। নিজে তিনটেয় উঠে ধ্যান করতেন। অসুস্থতাবশতঃ ধ্যান করতে না পারলে অন্যরা ঠিক মতো করছে কিনা খবর নিতেন। ধ্যান না করলে কঠোর শাস্তি হত। জীবনের শেষ কদিন এইভাবে তিনি সকলের গুরু, বন্ধু সর্বোপরি বিশ্বাস হয়ে জুড়েছিলেন। তাঁর উপদেশে অন্যান্য সন্ন্যাসী ক্রমেই ত্যাগের পথে কঠোর সেবার পথে স্থির চিত্ত হয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। সবার হৃদয়ে একটি মাত্র কথা—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

দেহ ছাড়বার কিছুদিন পূর্ব থেকেই মিশনের সব কাজ থেকে তিনি সরে দাঁড়ালেন। পরবর্তীদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়াই তার বাসনা। সর্বদাই ধ্যানে বসে থাকতেন। গভীর ধ্যান—মায়ার বন্ধন যেন খসে গিয়েছিল। তাই সমস্ত কিছুতেই উদাসীন হয়ে পড়তেন। শিষ্যরাও বুঝতে পারছিল সময় আসন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার বলেছিলেন, নরেন যখন জানতে পারবে সে কে—তখনি আর দেহ ধরে থাকবে না। একদিন এই কথা ভেবে একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'স্বামীজী, আপনি কে তা এখন বুঝতে পেরেছেন কি?'

গম্ভীর উত্তর দিলেন বিবেকানন্দ, 'হ্যাঁ, তা পেরেছি বৈ কি।'

সকলে এ উত্তর শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কেউ আর কোনো কথা বলতে পারলেন না।

দেহ ত্যাগের সাতদিন আগে পঞ্জিকা দেখতে চাইলেন। পাতা উলটে দেখে পাঁজি নিজের ঘরে রেখে দিলেন। তার পাতা ওল্টানোর ব্যগ্রতা থেকে মনে হল তিনি কোনো বিশেষ দিন খুঁজছেন। রোগ শয্যায় শুয়ে শুয়ে এক শিষ্যকে পাঁজি পড়ে শোনাতে বললেন। কিছুক্ষণ

পড়বার পর এক জায়গায় এসে শুনে তিনি বললেন, 'থাক আর দরকার নেই।'

তিনদিন আগে বেড়ানোর সময় আঙুল তুলে গঙ্গার তীরে একটি জায়গা দেখালেন। বললেন, 'আমার সৎকার এখানে করবি।' শেষ কদিন দেহে কোনো অসুখ ছিল না। উপরন্তু সমস্ত দেহ এক অলৌকিক দীপ্তিতে প্রভাময় হয়ে উঠেছিল। অন্তরের বিশুদ্ধ ছটা যেন বাইরে বেরিয়ে আসছিল। শেষের একদিন এক সঙ্গে সকলকে নিয়ে খাওয়া-দাওয়া সারলেন। তারপর সংস্কৃত ক্লাসে সব ব্রহ্মচারীদের যেতে বললেন। বিকেলে অনেক দূর বেড়িয়ে এলেন। বললেন শরীরটা হালকা মনে হচ্ছে।

সন্ধ্যেয় ফিরে আরতির ঘণ্টা বাজলে নিজের ঘরে গেলেন। ধ্যানের পর মালা জপ করলেন।

সামনে একজন ব্রহ্মচারী ছিলেন। বিবেকানন্দ ঘরের সমস্ত জানলা খুলে দিতে বললেন। শুয়ে পড়লেন তিনি। ব্রহ্মচারী পদসেবা করছে। রাত তখন নটা। অস্ফুটে তাঁর মুখ থেকে শিশুর কান্নার মতো স্বর বেরুল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর নিশ্বাস ছাড়লেন। তারপর নিশ্চল স্থির তাঁর দেহ। মুখমণ্ডলে এক অনির্বচনীয় জ্যোতি। যেন মহানিদ্রায় ঘোর ধ্যানমগ্ন।

ব্রহ্মচারী বুঝতে না পেরে নিশ্চয়ানন্দকে ডাকলেন। নাড়ী পাওয়া গেল না। সকলে ছুটে এল। একটা মহা আশঙ্কা যেন দুলতে লাগল। মহাসমাধি ভঙ্গের নিমিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম কীর্তন শুরু হল। কিন্তু বিবেকানন্দ সেই একভাবে শুয়ে আছেন।

সমবেত সকলের মধ্যে ক্রন্দন এসে যেন সাথী হল। ডাক্তার ডাকতে ছুটল কেউ। রাত সাড়ে দশটায় ডাক্তার এলেন। বারটা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত বললেন, প্রাণ দেহ ছেড়ে চলে

গেছে। অথচ আশ্চর্য দেহের কোনো পরিবর্তন নেই। চামড়ার বর্ণ সেই একই রূপ—বরং দেহের চতুস্পার্শে এক দিব্য বিভা। মুখাবয়বে প্রশান্তি। যোগের সাহায্যে সমাধির মধ্যে তিনি দেহ ছাড়লেন।

১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই শুক্রবার স্বামীজী এই পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন ত্যাগ করে চলে গেলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'আমি চল্লিশ পেরুচ্ছি না—' তাঁর একথাও সত্য বলে প্রমাণিত হল। কিন্তু এই স্বল্প বয়সেও পিছনে যে অদ্ভুত কর্মপ্রতিভা রেখে গেলেন তা তুলনাহীন। একটি মানুষ যেন জ্যোতির্মণ্ডল থেকে অকস্মাৎ পৃথিবীতে এসেছিলেন। এবং মানুষের মনকে সৎপথে পরিচালিত করে, অনন্য প্রতিভায় সমস্ত বিশ্ব জয় করে আবার আপন স্থানে চলে গেলেন।

যে কর্মরাশি থাকল তা চিরকাল ধরে জগতের কল্যাণের পথ নির্দেশ করবে। এবং সেই সঙ্গে বিবেকানন্দও সভ্যতার শেষ দিন পর্যন্ত অমর হয়ে থাকবেন।

কারণ মহাত্মা ব্যক্তির মৃত্যু নেই।

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

সমাপ্ত